

মধু মাস

-মধুমাস-

মধুমাস

শক্তিপদ রাজগুরু

সেনগুপ্ত এণ্ড কোং
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা—১২

প্রকাশক—
এস, আর, সেনগুপ্ত
৩।১এ, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট
কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ—
ব্রজরায় চৌধুরী

মুদ্রাকর—
শ্রীমণীন্দ্রকুমার মণ্ডল
ওয়েষ্ট বেঙ্গল প্রিণ্টিং ওয়ার্কস্ লিঃ
৮৭।২, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলি :- ৪

মূল্য—দেড় টাকা

শুভানুধ্যায়ী—

শ্রীকালীশ মুখোপাধ্যায়কে—

এই লেখকের :

পদাতিক

হেথা নয়

পথ বয়ে যায়

সতী সীমন্তিনী (২য় সং)

দিনগুলি মোর রইল না

শালপিয়ালের বন

ছোটদের :

যাত্রীরা হুসিয়ার

ঘরছাড়া (যন্ত্রস্থ)

কথামুখ

=বাবা=

নিজের জীবনকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দেবার চেষ্টা আমি করিনি, কিন্তু যে দিন দেখলাম পায়ের নীচে থেকে মাটী ধীরে ধীরে সরে যাচ্ছে, নীচে এগিয়ে আসছে অতলস্পর্শী ধ্বস···প্রাণপণে চেষ্টা করেছিলাম নিজেকে বাঁচাবার। আমার স্ত্রী, আমার ছেলে মেয়ে তাদেরকে রক্ষা করবার, কিন্তু দুর্বার আকর্ষণ, ওদের প্রচণ্ড আঘাত আমাকে ছিটকে ফেলে দিল—আমার মেরুদণ্ড ভেঙ্গে আমাকে কুঁকড়ে মুমূর্ষু করে ফেললে। সামনে যে পথ পেলাম সে পথ ধরেই এগিয়ে চললাম। কিন্তু সে পথ জীবনের নয়, সে পথ মানুষের জন্য নয়, সেপথ শেষ হয়েছে পশুত্বের সীমানায়—শয়তানের রাজ্যে! ওরা আমাকে মানুষের রাজ্য থেকে টেনে এনে শয়তানের রাজত্বে নির্ব্বাসিত করল!

আমিও একদিন মানুষ ছিলাম। মাটীর বুক থেকে আমি সদ্যকর্ষিত লাঙ্গলের ফলার ধারাবিভক্ত মৃত্তিকার মিষ্টি গন্ধে বুক ভরিয়েছি! ক্লান্ত পরিশ্রান্ত আমি যখন কাজের শেষে মাঠ থেকে বাড়ী ফিরতাম—দরজার কাছে ঝাকড়া বকুল তলায় দাঁড়িয়ে থাকত মন্টু আর মিন্টু, আমার ছেলে আর মেয়ে। আমাকে দেখেই তারা ছুটে আসত, মন্টু কাঁধ থেকে লাঙ্গলটা ধরে নিজের কাঁধে তোলবার চেষ্টা করত, আর

মিনু ছিল একটু বড়, চাষের বলদ দুটোকে হাঁকিয়ে নিয়ে সে গোয়ালের দিকে এগিয়ে যেত।

সারা ঘরে ছিল আমার লক্ষীর আবির্ভাব! গোলাভরা ধান…নধর গরু…আর নতুন বাছুর। তুলসী তলায় প্রদীপ জ্বেলে সন্ধ্যাকাশের অগণিত তারকার দ্যুতিমাখা আকাশের দিকে চেয়ে…স্বামী পুত্র কন্যার কল্যাণ কামনা করত বিন্দু…কল্যাণময়ী এক নারী। শঙ্খধ্বনির শব্দে সারা আকাশ মুখর হয়ে উঠত। এদিক ওদিক দেখে এগিয়ে এসে নিঃশব্দে প্রণাম করে সেদিন বিন্দু, অক্ষয় তৃতীয়ার ব্রত…আজকের দিনে স্বামীকে প্রণাম করে তার প্রসাদ পেতে হয়…সীমন্তের সিন্দুর অক্ষয় হয়ে থাকে।

বর্ষার সমারোহে আমিও মাঠের মাঝে জলকাদার বুকে অঝোর ধারা স্নানে আহরণ করবার আয়োজন করতাম প্রকৃতির বুকের শস্যসম্ভার। ছোট নদীর ভরাযৌবনা রূপের সঙ্গে তাল দিয়ে নৃত্য করত দিগন্ত প্রসারী সবুজ ধানশিশুর দল। কাশ, পদ্ম, শাপলার আলোভরা খালের বুকে ছায়া পড়ত পেঁজা তুলোর রাশের মত সাদা সাদা অজস্র মেঘের। কোথা থেকে আসে কোথায় যায়…কেউ জানেনা! আমার মন্টু আর মিনু চেয়ে থাকত ঐ আকাশের দিকে…হাতে পায়ে তাদের মাঠের জলকাদা…কাঁধ ভর্ত্তি পদ্ম শাপলা ফুলের স্তবক! মাঠ থেকে ওদের নিয়ে ফিরতাম…কোন দিন গানের সুরে ভরে থাকত সবুজ শান্ত মাঠের বুক…দূর আকাশে ভেসে আসত ঢাক ঢোল কাঁসির শব্দ। পাশের গ্রামে দুর্গাপূজার সমারোহ চলেছে। আমার মধু গন্ধে ভরা দিন—কত স্বপ্ন মাখা অতীতের স্মৃতি!

আমি ভালবাসতাম আমার ছেলে মেয়ে আমার স্ত্রীকে। অন্তরের সব স্নেহধারা উজাড় করে তাদের আমার করে নিয়েছিলাম।

মন্টুর সেবার খুব অসুখ। বিন্দুর চোখে ঘুম নেই। আমার

মাঠের কাজ বন্ধ, দুটো তিনটে ডাক্তার...রকমারি ওষুধ পথ্যি...আমার যথাসর্বস্ব পণ করে আমি আমার মন্টুকে বাঁচিয়ে তুলবার চেষ্টা করেছিলাম। প্রায় একমাস অক্লান্ত পরিশ্রমের পর আমি পেরেছিলাম···আমি আমার মন্টুকে সারিয়ে তুলতে পেরেছিলাম; আমার ব্যাকুল পিতৃহৃদয় সেদিন সমস্ত শক্তিকে একত্রিত করে তুলেছিল আমার সন্তানকে ফিরিয়ে আনতে।

শুধু সে আমার সন্তানই নয়···আমার সহচর—আমার দোসর আমার ভবিষ্যৎ! ওরই মাঝে বেঁচে থাকব আমি যুগ যুগ ধরে। আমি যে পৃথিবীতে এসেছিলাম...এই মাটির বুকে ঠাঁই পেয়েছিলাম। আমারও হিস্যা ছিল এই দুনিয়ার ফল ফসল আলো হাওয়ার বাটোয়ারায়, তারই স্বাক্ষর রেখে যাব ওরই জীবনে! আমার সমস্ত পরিশ্রমের সেও ছিল সঙ্গী!

ধানকাটার সময়, ঝাকড়া অশ্বত্থ গাছের নীচে তেলে পাড়ার বাকুড়ি প্রায় তিন বিঘে ক্ষেতখানা। রাশীকৃত ধানের স্তূপ···গরুর গাড়ী বোঝাই হচ্ছে। মিন্টু আর মন্টুও ছোট্ট হাত দিয়ে ছুটোছুটি করে ধান বয়ে নিয়ে আসে...ভাই বোনের হাসির শব্দে মাঠ যেন ভরে ওঠে। ধান বোঝাই গাড়ী নিয়ে ফিরে আসতাম, বিন্দু নোতুন কাপড় পরে দাঁড়িয়ে থাকত মা লক্ষ্মীকে বরণ করে নিতে। শাঁক বাজিয়ে উলুধ্বনি দিয়ে বরণ করে নিত সোনাফসলের দিনকে। ঘরে ঘরে পূর্ণতার সংবাদ।

এমনি দিনে ঝড় উঠেছিল! সারা মাঠে পড়ল তাবু, ভারি ভারি গাড়ী করে এসে হাজির হোল রকমারি ছোট বড় যন্ত্র। ছেলে বুড়োর দল ব্যাকুল দৃষ্টিতে চেয়ে থাকত ওই সব নাম না জানা বিশালাকায় পদার্থ গুলোর দিকে। কতলোক, জনশূন্য প্রান্তর—মহুয়া বাগান···পাহাড়ের নীচে থেকে নদীর দুপাশে ভর্ত্তি হয়ে উঠল ওদের যন্ত্রের পাহাড় তাবু

আর লোকজনের কোলাহল ; বড় বড় গাছগুলো কেটে ফাঁক করে দিল।

গ্রামের খবর এল...সরকারী লোক, লম্বা লম্বা ইস্তাহার···ঢোল সহরৎ সবকিছু করে জানিয়ে দিয়ে গেল, এই গ্রাম—আশে পাশের আরও তিনখানা গ্রাম···জমি জারাৎ জঙ্গল সব ছেড়ে দিয়ে যেতে হবে ! এখানে বাঁধ বসবে, ক্যানেল হবে ; আমাদের গ্রামখানা সামনের বছরই অতল তলে তলিয়ে যাবে। স্তম্ভিত হয়ে গেল জনতা ! বাকবদ্ধ মৌন জনতার মুখে ভাষা এল খানিক পরে।

সাত পুরুষের ভিটে মাটি, এইখানে জন্মেছে আমার পূর্ব্বপুরুষ। ওই ষষ্ঠীতলার বটগাছের অসংখ্য ঝুরি মাটিতে কত শত বর্ষ ধরে শিকড় গেড়ে বসে আছে...তাকেও সমূলে উচ্ছেদ করবে, টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলবে। এমনি আমরাও শত শত গৃহস্থ এক পরিবারের মত বাস করছি ; বংশ পরম্পরায়, কত সুখ-দুঃখে এক হয়ে দাঁড়িয়েছি, আজ কোন্ দুর্বার আঘাতে ছিটকে পড়ব ! স্তম্ভিত হবারই কথা। আশেপাশের গ্রাম থেকে লোক জমায়েৎ হল। ষষ্ঠীবটতলায়, গ্রামের মেয়েরা অসংখ্য প্রদীপ জ্বেলে যায় রোজ সন্ধ্যাবেলাতে...তারা আজ প্রদীপ হাতে দূরে দাঁড়িয়ে রইল ! গ্রামের প্রবীন ও নবীনরা বলে চলল—"আমরা যাবনা—কিছুতেই যাবোনা ! সাতপুষের ভিটে ছেড়ে কোনমতেই যাবেনা।"

যাবো কোনখানে ? মাগ ছেলের হাত ধরে পথে পথে ঘুরে বেড়াব জমি জারাৎ ছেড়ে ?

কিন্তু কোন আবেদন নিবেদনেই ফল হলোনা ! যেতে আমাদের হবেই। নদীর ধারে পাহাড়ের গায়ে এর মধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে সুন্দর ছবির মত পাকা বাড়ী। ছোট ছোট শাল সেগুনের চারা মনোমত করে বসান হয়েছে, ঘাসের বুকে লাল কাঁকরের

আস্তরণ ছড়িয়ে পথের নিশানা আঁকা হয়েছে। গ্রামের সবাই জমা হয়েছে; সেরেস্তাদার—পাইক বরকান্দাজ এসেছে বন্দুক নিয়ে। জমির খেসারৎ দেওয়া হচ্ছে সরকার থেকে।

আমিও নাম ডাকা হতে এগিয়ে এলাম। কাঁপছি···আজ আমার সাত পুরুষের ভিটে মাটির বিনিময়ে পেলাম কতকগুলো নোট! ওই মাটিতে আর আমার কোন দখলই রইল না—রইল না কোন দাবী। অজ্ঞাতেই আমার হাতের ওপর ঝরে পড়ল দু'ফোঁটা চোখের জল। কতক্ষণ এভাবে ছিলাম জানিনা, হঠাৎ করে ডাক শুনে চমকে চাইলাম। সেরেস্তাদার একগাল হেসে দুপাটি দাঁত বার করে বলে ওঠে, —আমাদের পাওনাটা?

"বুকের রক্ত বেচে গেলাম সেরেস্তাদার মশাই, এর পরেও আবার দিতে হবে?"

কথার জবাব না দিয়ে আমার হাত থেকে একটা নোট তুলে নিয়ে বলে—"এই নিলাম—বেশী আর কই বল?"

নিলর্জের মত হাসতে থাকে, মনে হয় ওর দাঁতপাটি খুলে দিই এক চড়ে—কোন রকমে সামলে নিয়ে বাইরে এলাম।

সারাগ্রামে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে। এ দৃশ্য আগে কোনদিন দেখিনি। দেখেছিলাম দু' চার জন তীর্থে যাচ্ছে দূরদেশে, অনেকে এসেছে দেখা করতে। এ কিন্তু সম্পূর্ণ আলাদা! প্রত্যেকের সঙ্গে প্রত্যেকের বন্ধন চিরদিনের জন্য ছিন্ন হতে যাচ্ছে। এতদিন যেন এক পরিবারে বাস করেছে, আজ সব কে কোন দিকে চলে যাবে। গ্রামের দীনুখুড়ো—নবীন—গদাই এরা সবাই পাহাড়ীর নীচে ডাঙ্গাতেই বাস করতে চলেছে, গ্রামের কাছাকাছি। আশা করে ওরা—সরকারী সাহেবরাও বলেছে সবাইকে···ওখানে বছর কয়েকের মধ্যেই ফসল ফলবে। ওরা যেন ওইখানেই বসবাস করে। টংরা

পাহাড়ী মাটিতে হাঁ করে ফসলের আশায় যে বসে থাকতে পারে থাকুক···আমাকে সংসার পালন করতে হবে। পরিশ্রম করে রোজগার করতে পারব যেখানে সেইখানেই যাবো। সবই যখন ঘুচে গেল তখন আর মাটির মায়া কেন পিছুটান হয়ে থাকবে?

গ্রামের অনেকেই চলে যাচ্ছে! গরু-বাছুর, চাষের বলদ, ছাগল যার যা আছে বিক্রী করে দিয়ে চলে যাবে। কদিন ধরে পাইকারদের আসা যাওয়া সুরু হ'য়েছে গ্রামের পথে ষষ্ঠীবটতলায়। সস্তায়— চলে যাবার মুখে যে যেমন দাঁও কসে গরু-বাছুর কিনে নিতে পারে।

ছাতা-লাঠি হাতে দাড়িয়াল গরুর ব্যবসায়ীরা লেজ দুমড়ে পেছনে গোঁত্তা মেরে গালাগাল দিয়ে গরুর তেজ পরীক্ষা করছে। নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে গরুর মালিকরা। কতদিনের সুখ-দুখের সঙ্গী ওরা—কত রৌদ্রে কত বর্ষায় মাঠের কঠিন মাটিতে ওরা এক সঙ্গে পরিশ্রম করেছে। আমার একযোড়া বাঘা বলদ তাদেরও তুলে দিলাম ওদের হাতে। নধর গরু বাছুর সমেত, সে ছিল আমার ছেলেদের মতই সমান স্নেহের পাত্র। সেও যেন বুঝতে পারে আজ তাকে অজানা কোন লোকের হাতে চিরদিনের জন্য তুলে দিচ্ছি সামান্য কয়েকটা টাকার বিনিময়ে। অস্ফুট কণ্ঠে আর্ত্তনাদ করে ওঠে ওটা, আর কালো চোখের কোল বেয়ে গড়িয়ে পড়ে অশ্রুরেখা। মিনু, মনু কাঁদতে থাকে, নীরবে মুখ ফিরিয়ে নিই।

মনু গোল বাধাল শেষকালে—তার ছোট্ট খাসি ছাগলটাকে কিছুতেই সে বিক্রী করবে না, জোর করে চেপে ধরে থাকে। বাড়ীতে কেঁদে কেটে একাকার করে—খাবে না। বিন্দু বলে ওঠে, "থাকনা ওটা; সবই গেল ওকে না হয় নিয়েই চল।"

"নিজেরা কোথায় থাকব জানিনা, আবার ওই ছাগল?"

"তাহোক, আমাদের যদি আশ্রয় জোটে, ওরও জুটবে। বিচোনা ওকে।"

পাইকারদের লোলুপ দৃষ্টি ছিল খাসিটার নধর দেহের পানে। কচিমাংস। খাসিটার কিন্তু কোন চিন্তাই নাই। একমনে মাথা নেড়ে কচি পাতা চিবিয়ে চলেছে, পাশে তাকে আগলে রয়েছে মনু।

শেষ পর্য্যন্ত খাসিটাও সঙ্গী হল আমাদের।

সেদিনের কথা আজও মনে আসে। শেষ বিদায় নিয়ে এলাম পাড়ার দীনু খুড়ো, প্রসন্ন ঠাকুর, নিতাই আচার্য্যি সবারই কাছে। মিত্তির বুড়ী কেঁদেই ফেলল, আর হয়ত এ-জীবনে দেখা হবে না। বুড়োশিবতলা, দুর্গামণ্ডপ, ষষ্ঠীবটতলা সব কিছু আমার চোখে আর কোনদিনই ফুটে উঠবে না। এই মাটিতে আর পায়ের চিহ্ন পড়বে না কোন দিনই। চোখের সামনে ভেসে উঠছিল কত আনন্দের দিন···বাবা, ঠাকুর্দ্দা আরও কত নাম না জানা মুখ। নিশীথ রাতে সামান্য মাত্র জিনিষ-পত্তর নিয়ে স্ত্রী-পুত্র কন্যার সঙ্গে গরুর গাড়ীতে করে বার হয়ে এলাম চিরদিনের জন্য। পিছনে পড়ে রইল ছায়া-ঘেরা সুপ্ত গ্রামসীমা! মাঝে মাঝে দু একটা কুকুরের ডাক ভেসে আসে, আবার সব নীরব। বিন্দুকে ডাকলাম, সাড়া পেলাম না—বোধ হয় সেও কাঁদছে। মনু-মিনু ঘুমিয়ে পড়েছিল। আজ বিশাল বিশ্বে আমি নিঃসহায়, নিরাশ্রয়—সঙ্গী মাত্র তিনজন; বিন্দু, মিনু আর মনু।

ভাগ্যের হাতছানিতেই এসেছিলাম সেদিন এই দেশে। তখন ভাবি নাই এই দেশের মাটির অতলের কালো কয়লার মতই এখানের প্রতিটি মনের অতলেও পুঞ্জীভূত হয়ে আছে ঘৃণা, লালসামাখা কোন কালো এক দৈত্য!

আশায় বুক বেঁধে উজ্জল ভবিষ্যতের স্বপ্ন-চোখে সেদিন নামলাম এখানের ছোট্ট ইষ্টিশানে। চারদিকে লম্বা লম্বা যন্ত্র—চিমনীর মুখ থেকে কালো ধোঁয়ার অবিরল কুণ্ডলী, বনতুলসীর ঝোপ, মাঝে মাঝে অতল ধ্বস, নীচু দেখা যায় না; সবুজের নিশানা নাই··· কেবল কালোয়কালো! কালো এর আকাশ, কালো এর মাটীর রং, কালো এর মাটির অন্তর···কালোয় কালিমালিপ্ত হয়ে গেছে এখানের মানুষ। সেদিন বুঝিনি···ঝড়ের মুখে নোঙরছেড়া নৌকা সামনে যে কোন বন্দর পায় সেইখানেই এসে ভিড়ে যায়—আমার অবস্থাও ঠিক তেমনি।

কেমন যেন চেনা মুখ দেখলাম ষ্টেশনে! খুব চেনা অথচ নামটা যেন মনে আসে না। হঠাৎ মনে পড়ল, হ্যাঁ জয়ন্তই! আমাদের পাশের গ্রামেরই ছেলে, যুদ্ধে গিয়েছিল। সেইখানে থাকবার সময়ই ওর বাবা মা মারা যায়। অবস্থাও বিশেষ ভালো নয়, কাজেই বাবা মায়ের সঙ্গে সঙ্গেই দেশের সম্পর্ক ওর শেষ হয়ে যায়। কিসের জন্যই বা যাবে? যুদ্ধ থেকে ফিরেছিল কিনা অনেকেই জানে না—আমিও খোঁজ খবর নিইনি। শুনেছিলাম লোকের মুখে—সে নাকি মারাত্মক রকম জখম হয়েছিল, তারপরে আর কোন খবর পাইনি।

আজ দূর থেকে তাকে দেখে ডাকতে সাহস পাই না, কে জানে অন্য কেউ যদি হয়; তা' ছাড়া জয়ন্তর চেহারা এর চেয়ে অনেক ভালো, বলিষ্ঠ গড়ন, এ কিন্তু সে রকম নয়। তবু কেন জানি না ওর দিকেই এগিয়ে গেলাম। কয়েকজন লোকের সঙ্গে কথা বলছিল। আমি নাম ধরে ডাকতেই—একটু চমকে ওঠে,—হ্যাঁ জয়ন্তই! অজ্ঞাতেই একটা স্বস্তির নিশ্বাস বার হয়ে আসে! দূর অজানা জায়গাতে যাহোক একজন জানাশোনা নিজের লোকের সন্ধান পাওয়া যায়।

জয়ন্ত বিস্মিত হ'য়ে যায় ছেলে মেয়ে নিয়ে এখানে আমাকে আসতে দেখে। সমস্ত ব্যাপারটাই খুলে বল্লাম তাকে। স্তম্ভিত হয়ে শুনে যায় সে আমাদের কথা। পিতৃপুরুষের ভিটেমাটি বলতে যেটুকুও অবশিষ্ট ছিল আজ তাও তার চলে গেল। এই দুঃখটুকুই হয়ত তার মনটাকেও চঞ্চল করে তুলেছিল, তাই আমার নিরাশ্রয় অবস্থা দেখে বোধহয় তার মন গলে উঠল। বলে ওঠে সে—

"কোথায় থাকবেন ?"

"কোন ঠিক নেইত, কোথায় জোটে আশ্রয় !"

হেসে ওঠে জয়ন্ত—"এখানে আহার মিলতে পারে—আশ্রয় পাবেন না। চলুন আমার ওখানেই উঠবেন, খালিই ত পড়ে আছে বাড়ীখানা। তারপর চাকরী বাকরী একটা জুটলে আশ্রয়ও তারাই দেবে।"

এতদিন স্বাধীনভাবে বাস করে এসেছি। আমার নিজের বাড়ী, ঘর, ক্ষেত খামার, আর আজ মাথা গোঁজবার ঠাঁইটুকুর জন্য পরের দয়ার প্রত্যাশী হতে হল। মন সায় দেয়না ; হেসে ওঠে জয়ন্ত।

"লজ্জা করলে কি চলে বাইরে বার হয়ে ? হয়ত অসুবিধা হবে, কিন্তু কি করবেন মানিয়ে নিতে হবে তো ? চলুন…"

কুলি কোথায় পাই ; ক্ষেত থেকে ধান বয়ে বাড়ী এনেছি, কিন্তু বাক্স পেটরা নিয়ে নিরাশ্রয় হয়ে রাস্তায় বার হইনি। আজ প্রথম সেই সঙ্কোচই যেন বড় হয়ে উঠল ; কিন্তু উপায় নাই !

পথে বার হয়ে প্রথম শিক্ষা পেলাম…লজ্জার মাত্রা কমাতে হবে—অসুবিধা হলেও বিনা প্রতিবাদে সহ্য করতে হবে। জয়ন্তর সঙ্গে…খাড়া চড়াইয়ের উপর বুকভোর বনতুলসী গাছের ফাঁকে সুঁড়ি পথ বয়ে বাক্স পেটরা মাথায় বার হয়ে পড়লাম।

চাকরী ! সারা পরিবারের মুখে দিনান্তে দুমুঠো অন্ন—পরণে একখানা কাপড় আর মাথা গোঁজবার মত একটু আশ্রয়, এই ভাবনাই

আমার কাছে সবচেয়ে বড় হয়ে উঠল। জমি বিক্রীর সামান্য যা সঞ্চয় তা থেকে খরচ করলে আর চলবে কতদিন। সারাদিন এখানে ওখানে ঘুরি, সকাল থেকে কলিয়ারীর ফটকে ধর্ণা দিয়ে থাকি, ম্যানেজার সাহেবরা আসেন—দারোয়ান হাঁকিয়ে দেয়, আমাকে কথা কইবার সুযোগ তারা দেয় না। ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে শূন্য হাতে বাড়ী ফিরি!

বিন্দু সাগ্রহে প্রশ্ন করে—"হল কিছু"

মাথা নাড়ি, সেই একই জবাব—কোথাও কোন আশা নাই।

ক্রমশঃ ম্যানেজারদের কাছ পর্যন্ত এগিয়ে যাবার কায়দা দুরস্ত করে ফেললাম। এত সোজা ব্যাপার, কিন্তু এর আগে কখনও করিনি; তাই জানতাম না। দ্বারোয়ানকে একটা সিকি এগিয়ে দিতেই ব্যাটা চুপ করে যায়। বুঝলাম, এই পথ। সোজা এগিয়ে গেলাম ম্যানেজার সাহেবের কাছে, নমস্কার করে দাঁড়ালাম—আমার কথাটা নিবেদন করলাম কাতর কণ্ঠে। কিন্তু, ম্যানেজার নির্বিকার—তার মুখে কোন ভাবান্তরই নেই, সিগারেট মুখে অন্য দিকে চেয়ে রয়েছেন।

এতদূর এগিয়েও হতাশ হয়ে ফিরে আসতে হল। চোখ ফেটে কান্না বার হয়ে এসেছিল, কিন্তু গুদাম বাবুকে আসতে দেখে ফিরে চাইলাম। কানে পেন্সিল গোঁজা মোটা খাটো চেহারা, কাছে এসে গলার স্বর খাটো করে বললেন—

"শুধু হাতে এসে কি চাকরি হয়? নোতুন এসেছ বুঝি?" পেন্নামী নিয়ে এস—তবে কথাবার্ত্তা।"

কিছু পেন্নামী—দ্বারোয়ানের ঘুস আর সাহেবের পেন্নামী। দারোয়ান চার আনাতে কাজ করে—আর ম্যানেজার সাহেব কত চান কি করে জানব! তা দোবই বা কোথা থেকে! ভাবতে

ভাবতে এগিয়ে আসি বাড়ীর দিকে। চাকরী আমার চাইই, কিন্তু, পেন্নামীর কথা মনে পড়তেই সব চিন্তা যেন লোপ পেয়ে যায়।

বাড়ীর বাইরে মন্টুর খাসিটার উপর নজর পড়তেই থমকেই দাঁড়াই। নধর, তেল চিক্কন গা—চর্বিতে পুষ্ট হয়ে উঠেছে; দেখলেই চোখে লাগে। দেবভোগ্য জিনিষ! পেন্নামী!··· মনটা যেন আশার আনন্দে ঝলমল করে ওঠে! মন্টু কাঁদবে—দু তিনদিন হয়ত কিছু খাবেই না। কিন্তু তা দেখলে আমার চলে কৈ? বাইরে বার হয়ে এসে স্নেহ, মায়া, লজ্জা কমাতে হবে; ওসবের ঠাঁই এ নয়!

চারদিকে দেখে ছাগলটাকে পাঁজাকোলা করে দৌড়ে এসে বন-তুলসীর ঝোপে ঢুকি। চুরি—হ্যাঁ চুরিই ত! নিজের ছেলের কাছে এ দৈন্য আমার প্রকাশ করা চলবে না। আমার ক্ষমতা নাই সৎভাবে সংসার চালাবার, প্রণামী গুঁজে দেবার। ওদের স্নেহ প্রীতির এই জিনিষটাকে বয়ে নিয়ে গিয়ে আমি আমার কর্ত্তব্য পালন করব। আমার ছেলেমেয়ের আহার্য্য জোগাবার পন্থা বার করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার। কিন্তু আমি তা পারি নি। আমার ছেলেরই প্রিয়তম বস্তুটিকে চুরি করে নিয়ে গিয়ে আমার কর্ত্তব্য পালনের পন্থা করছি। এযে আমারই লজ্জা—আমারই দৈন্য—তা আমারই মনের কাছে ধরা পড়েছিল, তাই চোরের মত ছাগলটাকে বয়ে নিয়ে পালালাম অফিসের দিকে।

ম্যানেজার সাহেবের ভেট, দারোয়ানজী লোলুপ দৃষ্টিতে ছাগশিশুর পানে চেয়ে রামজীর নাম করে মুখ ফেরালেন। আমি বিজয়দর্পে প্রবেশ করলাম ম্যানেজারের অফিসে।

এবার ম্যানেজার সাহেব হেসেই কথা বললেন,

—"বাঃ বেশ ছাগলটি ত!"

...সাহেব নেমকহারাম নন, কাজ আমাকে দিলেন। সেই দিন থেকেই আমি কাজে লেগে গেলাম।

সাইডিং এ মালগাড়ী ঠেলে দিয়ে গেছে। শূন্য মালগাড়ী গুলোকে কয়লা ভর্ত্তি করতে হবে। দাঁড়িয়ে থেকে কুলি কামিনদের কাজ করানো, যাতে কাজ তাড়াতাড়ি হয়। মাঠে কাজ করা অভ্যাসটা ছিল তাই ও কাজটা আমার মন্দ লাগল না। সব চেয়ে বড় সান্ত্বনা ছেলে-মেয়েদের মুখে আমার রোজগারের অন্ন দিতে পারব—নিজের আশ্রয় ঠিক করতে পারব—এই সান্ত্বনাই আমার কাজ করবার ক্ষমতা দ্বিগুণ করে দিলে।

সামান্য যা কিছু পয়সা ছিল তাই দিয়ে বাড়ী ফেরার সময় মিনু আর মন্টুর জন্য তেলেভাজা মিঠাই কিনে নিয়ে বাড়ীর দিকে এগোলাম। কয়লার গুঁড়োতে নিজের চেহারাখানার দিকে চেয়ে দেখবার সময় পাইনি কেমন হয়েছে। জামা-কাপড়গুলোতে চেপে বসেছে কয়লার গুঁড়ো, মাথার চুলে জমেছে একরাশ কয়লা—কির কির করছে। তবুও হালকা মনে বাড়ীর দিকে এগিয়ে আসি।

সন্ধ্যা হয়ে আসছে, চারপাশের উঁচু নিচু মাটির স্তরের গায়ে গায়ে জ্বলে কলিয়ারীর বিজলী বাতিগুলো...

ধোঁয়ায় আকাশ কাল হয়ে গেছে। নিচু আকাশের গায়ে চাপ বেঁধে রয়েছে ধোঁয়ার জমাট আস্তরণ। জঙ্গলীগাছপাতার আস্‌টে গন্ধ আর ধোঁয়ার বিশ্রী গন্ধ মিশে কেমন এক নোতুন পরিবেশের সৃষ্টি করে।

বাড়ীতে পা দিতেই বিন্দু বার হয়ে আসে। অন্যদিন জিজ্ঞাসা করত—"হল কিছু ?" আমারও দিতে হত সেই এক উত্তর। আজ সে আমার কয়লামাখা চেহারা দেখে থমকে দাঁড়ায় ; সে বিস্মিত হয়ে গেছে। মনে পড়ে, আগে মাঠ থেকে কায করে কাদাগায়ে ফিরলে সে একটু অসন্তুষ্টই হত। বলত—

"কাদা না লাগালেই কি নয় ?"

তাড়াতাড়ি নিজেই জলের বালতি এনে ধোয়াতে বসত। আজ আমার কালিমাখা মূর্ত্তি দেখে ক্রমশঃ তার স্তম্ভিত মুখের উপর নেমে আসে নিশ্চিন্ততার হাসি! এগিয়ে এসে বলে—"চাকরী পেয়েছো তাহলে ?"

আমার কয়লামাখা মূর্ত্তিখানা দেখবার জন্যই সে যেন সাগ্রহ প্রতীক্ষায় বসেছিল। আমার চেহারায় এই কালোর প্রলেপ তার মনের কালিমাকে দূর করে দেয়। মনে হল গ্রামের থেকে এখানের মাটীতে এসে বেশ একটা পরিবর্ত্তন এসেছে বিন্দুর।

মিনু ছুটে আসে—হাত থেকে শালপাতার ঠোঙ্গাটা তুলে নেয়—"মনুকেও দিবি।"

মনু খায়নি, সারাদিন আজ কেঁদেছে। বিন্দু মিনু দুজনেই খবরটা দেয়—ওর ছাগলটা চুরি হয়ে গেছে।

বিন্দু বলে ওঠে—"মাগো, কি দেশ! বাড়ীর সামনে থেকে অমন ছাগলটা নিয়ে পালাল, কোন হদিসই পাওয়া গেল না ?"

কথা বলি না, নীরবে রুটি চিবুতে থাকি। চোরের উদ্দেশে গালাগাল দিতে থাকে বিন্দু—"মর, ওলাওঠায় যা! তোকে যেন আর বাড়ী ফিরে যেতে হয় না, অবলা জীবকে চুরী করে নিয়ে গেলি—ধর্ম্মে সইবে না।"

রুটি গিলতে পারি না, গলায় যেন দলা পাকিয়ে আসে। কোন রকমে মাথা নীচু করে নীরবে চিবোবার চেষ্টা করি। মিনু টিনের গেলাসে করে চা নিয়ে আসে। বিন্দু হাত ধোবার জল নামিয়ে দেয় ঘটিতে। বাড়ীতে আবার যেন শান্তি ফিরে আসে আগেকার মত।

জয়ন্ত ছেলেটিকে ভাল লেগেছিল। সেদিন ইষ্টিশানে তাকে না পেলে কোথায় থাকতাম—কি হত, কিছুই ভাবতে পারি না। ডেকে

এনে আশ্রয় দিয়েছিল, কদিনেই বেশ নিজের মত হয়ে উঠল। সারাদিন কাজ করবার পর সন্ধ্যাবেলা ফিরে মিনু আর মনুকে পড়াত। বিন্দুর মনের কোণে দেখতাম একটা কথা উঁকি মারছে, কিন্তু বলেনি কোনদিন। সে কথা তখন তার না বলাই রয়েছিল।

কোম্পানী থেকে বাসা পেতেই জয়ন্তর আশ্রয় ছেড়ে এলাম নিজেদের বাসাতে। সেদিন জয়ন্তকে দেখলাম, তার হাসির মাত্রা একটু কমে গেছে। মালপত্র নিয়ে বার হয়ে এলাম, বার বার দেখি মিনু কেন যেন পেছনে চাইছে। সবাই এগিয়ে এসেছে, মিনুকে ডাক দিলাম, "আয়—তাড়াতাড়ি করে হাঁট!"

অপ্রস্তুত হয়ে সে জোরে পা বাড়াতে থাকে। জয়ন্ত তখনও ওর বাসার কাছে দাঁড়িয়ে চেয়ে রয়েছে আমাদের দিকে। বিন্দুর চোখে-মুখে আগেকার সেই না বলা কথা। কেন জানি না একটু খুসীই দেখাচ্ছে তাকে।

মিনু এগিয়ে আসছে।

বেশ দিন কেটে যাচ্ছিল। ছোট্ট একটু আশ্রয়। জয়ন্তই সেদিন মনুকে স্কুলে ভর্ত্তি করে দিয়ে এসেছে। মাঝে মাঝে সন্ধ্যাবেলায় আসে, মিনু-মনুকে পড়াও দেখিয়ে দেয়—আমার সঙ্গেও কথাবার্ত্তা বলে। সারাদিনের কাজের পর নিরলস—নিস্পৃহ জীবন, সামান্য আয়, কষ্টের মধ্য দিয়েও আমাদের কেটে যায় শান্তিতেই।

কিন্তু, কোথায় যেন ঝড়ের একখানা কালো মেঘ ঘনিয়ে এসেছিল আমার অজ্ঞাতেই, আমি টের পাইনি।

কুলি কামিনদের নিয়ে কাজ করাই; দু' চারজন লোক বাড়তি দেখিয়ে হাজিরা বাবুর সঙ্গে সড় করে দু' একটাকা উপরি রোজগার করা নাকি এখানকার দস্তুর। প্রথম কয়েকদিন পর হাজিরাবাবু আমার হাতে দুটো টাকা দেন পান খাওয়া বাবৎ। একটু বিস্মিত হয়ে যাই!

গরীব কুলি কামিনদের খাটুনির ওপর কমিশন আর মিথ্যে নাম লিখে চুরির পয়সা নিতে কেমন যেন মন সায় দেয় না।

"সেকি বাবু!"

"আরে চোরের দেশে কি আর সাধু থাকে!"

"কিন্তু যদি কেউ বুঝতে পারে—?"

হেসে ওঠেন হাজিরাবাবু, "যে আসে লঙ্কায় সেই হয় রাক্ষস। সাধু কে? তোমার ম্যানেজার, লোডিং বাবু, রেজিং সাহেব সবাই পুকুর চুরি করে; আর আমরা দু' চার টাকা নিলেই কি যত পাপ? দাদারে, মাথায় ছুঁইয়ে পকেটে রেখে দে, মা লক্ষীর অপমান করিস না।"

টাকা দুটো হাতে যেন পাথরের মত ভারি হয়ে আসে।

সন্ধ্যাবেলাতে বাড়ী ফিরে বিন্দুর হাতে টাকা দুটো দিতে বিন্দু একটু বিস্মিত হয়। ব্যাপারটা সমস্ত বলতে সে জবাব দেয়, "এ বিষ তুমি ছুঁয়োনা, ওদের রক্ত জলকরা পয়সায় ভাগ বসালে ধর্মে সইবে না। আমরা ছেলে-পুলে নিয়ে ঘর-সংসার করি, ভগবান যা দেবেন তাই দিয়েই চালাব; এ পাপের পয়সা তুমি ছুঁয়োনা।"

বিন্দু টাকা দুটো ফেরৎ দেয়। কাকে টাকা ফেরৎ দোব আমি ঠিক করতে পারিনা। মনে মনে প্রথম চিন্তা দেখা দেয়—কেন নোবনা ও টাকা? আমার যেদিন কিছুই ছিলনা—সেদিনও ওরা আমার কাছ থেকে ঘুস নিয়েছে; আর সেই ঘুস যোগাড় করেছি আমি চুরি করে। আজও প্রকাশ করতে পারিনি সেকথা, আমাকে তারাই ত প্রথম দিন থেকেই চোর বানিয়ে তুলেছে—আজ আমিও বা কেন নোবনা। মন্টুর ডাকে ফিরে চাইলাম—

"খেতে ডাকছে বাবা!"

মন্টু-মিন্টু আর আমি খেতে বসি। মন্টু কি যেন বলে চলেছে—ইস্কুলের গল্প, পরীক্ষায় সে নাকি ভাল নম্বর পেয়েছে। মাষ্টার

বলেছে ভাল করে পড়লে সেই ফাষ্ট হবে, বিনা মাইনেতে পড়তে পাবে। মিনুর আপশোষ হয়!

"বাবা আমিও স্কুলে যাব!"

ধমকে থামিয়ে দিই তাকে। "এত বড় মেয়ে আর ইস্কুলে যায়না।"

মিনুকে বাইরে রোজই যেতে হত। সকাল বেলাতেই বাড়ী থেকে বার হয়ে যাই কাজে—ফিরি সেই সন্ধ্যায়। মধ্যে আধঘণ্টা খাবার ছুটি, সেই সময়ের মধ্যে বাড়ী এসে খাওয়া হয় না। মন্টুও দুপুরে যায় ইস্কুলে, বাধ্য হয়েই মিনু আমার খাবার পৌঁছে দিয়ে আসে।

সাইডিংএর একধারে একটা কয়লার স্তূপের পাশে মালগাড়ীর ছায়াতে বসে খাই; মিনু পাশে বসে থাকে—ব্যগ্র হাতে খাবার দেয়; গামছাখানা দিয়ে বাতাস করে। সেদিন ম্যানেজার বাবুকে হঠাৎ সেই সময় আসতে দেখে চমকে উঠি! এ সময় বড় একটা বার হন না তিনি। হ্যাট্ মাথায় ব্রিচেসপরা মূর্তিটা লোহার নাল বাঁধান লাঠি ঠুকতে ঠুকতে এগিয়ে আসে। কে জানে, কি দুঃসংবাদ বয়ে নিয়ে আসছে! খাওয়া ছেড়ে দিয়ে উঠে দাঁড়ালাম। একপাশে দাঁড়িয়ে থাকে মিনু, ভয় চকিত দৃষ্টিতে মাঝে মাঝে মূর্তিমান আতঙ্কের দিকে তাকায়। তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে চেয়ে দেখেন ম্যানেজার বাবু আমাদের দুজনের দিকে। নমস্কার করতেই তিনিও নমস্কার করেন। একটু বিস্মিত হই! এর আগে নমস্কার করলে মাথাও নাড়তেন না—আজ হাত তুলেই প্রতিনমস্কার করে হেসে এগিয়ে আসেন।

"কি করছ রতন?"

"খাচ্ছি স্যার।"

"বেশ—বেশ। লোডিং ত মন্দ হয়নি; ওদেরকে লাই দিয়ো না, যত ধমকাবে ততই কাজ করবে; এই হচ্ছে কাজ করানোর রীতি।" হঠাৎ বলে ওঠেন মিনুকে দেখিয়ে—

"এ কে ?"

"আমার মেয়ে স্যার। খাবার নিয়ে আসে—নমস্কার কর মিনু।"

মিনু কোন রকমে হাত তুলে নমস্কার করে।

ম্যানেজার সাহেব হেসে বলেন, "থাক—থাক—কি নাম তোমার ?"

মিনু জবাব দেয়—"আমার নাম মিনতি।"

"পড়াশোনা জান কিছু ?"

"সামান্য জানি।"

"বেশ। আচ্ছা রতন, আজকে কাজ মন্দ হয়নি, কালও ফুল ক্যাপাসিটি ওয়াগন আসবে, সাইডিং এর একটু চেষ্টা করো যাতে ওগুলো হয়ে যায়। খেয়ে নাও তুমি।"

উত্তরের অপেক্ষা না করেই শিষ দিতে দিতে ম্যানেজার বাবু চলে যান। আমি আবার খেতে বসি। মিনুর সেই সহজ স্বাভাবিক হাসিখুসী ভাব যেন আর ফিরে আসে না। জিজ্ঞাসা করে—

"ওকে বাবা ?"

"উনিই ত ম্যানেজার। মস্ত পণ্ডিত লোক।"

মুখ নীচু করে বসে থাকে মিনু। খাওয়ার পর এঠো বাসনগুলো বেঁধে নিয়ে বাড়ীর দিকে পা বাড়ায়। ওয়াগনের ছায়ায় গামছা বিছিয়ে বসে একটা বিড়ি ধরিয়ে মনের আনন্দে টানতে থাকি। মানসপটে ম্যানেজার সাহেবের হাসি মুখখানা ভেসে ওঠে।

হাজিরীবাবুর কাছ থেকে সপ্তাহে প্রায় ৮।১০ টাকা উপুরি পাই, সেদিন মাইনে আনতে গিয়েছি। কাজের পর ক্যাশঘরের ছোট্ট জানলাটার পাশ দিয়ে সারবন্দী লোক পার হতে থাকে। খাজাঞ্চিবাবু নাম ডেকে যার যা পাওনা সপ্তাহেই মিটিয়ে দেন। দেখি--আমার নামের অঙ্কে এ সপ্তাহে দশ টাকা বেশী হয়েছে। জিজ্ঞাসা করতেই বলেন ক্যাশবাবু—

"খোদ ম্যানেজার সাহেব মাইনে বাড়িয়েছেন তোমার? ব্যাপার কি বলত?"

ব্যাপারটা আমিও জানি না। তবু বাড়তি মাইনেটাও পকেটে ঢুকিয়ে মনের আনন্দে সরে পড়ি। দশ টাকা নয় যেন রাজ্যজয়ই করেছি আর কি?

বিন্দুকে সমস্ত টাকাটাই তুলে দিই। মা কালীর ঘটে ঠেকিয়ে ষোল আনা তুলে রাখে—মানসিক আছে।

পরের দিনই হাটবার। কলিয়ারীর ছুটি। সারা আবহাওয়াটা একদিনের জন্য শান্ত হয়ে আসে। কলিয়ারীর ধোঁয়া নির্মল আকাশকে একদিনের জন্য আর কালিমালিপ্ত করে তোলে না। ল্যাঙ্কাশায়ার বয়লারের ভস ভস শব্দ, পিট হেডগিয়ারের ঘূর্ণায়মান চাকার গতিবেগ, ষ্টীমলিফ্টের ঢং ঢং শব্দ—সব কিছু নীরব। সমস্ত আকাশ যেন ধোয়া-মোছা আঙ্গিনায় কোন দেবতার আগমন প্রতীক্ষা করছে। নীরবতা ছাপিয়ে ভেসে ওঠে বাঁশী আর মাদলের সুর। কোথাও বা ঢোল করতালের শব্দ, বেসুরো কণ্ঠের চীৎকার—

"আগে চলে শ্রীরাম পিছু জানকী
হো……"

যন্ত্রের কর্কশ ধ্বনি আজ আনন্দের লহরে চাপা পড়ে গেছে।

মনু আর মিনুকে নিয়ে হাটে যাই। রকমারি লোকের ভিড়, মনুর লোভ একটা বড় লাল মুরগীর ওপর, মিনু বলে ওঠে—"দ্যুৎ মুরগী আবার পোষে? যা নোংরা।"

সপ্তাহের বাজার করে, ওদের জন্য জামা-শাড়ী কিনে, কাঁচের চুড়ি কিনে, মনুকে একটা বল কিনে দিয়ে বড় রাস্তা ধরে বাড়ী ফিরি। শব্দমুখর আনন্দমুখর পথে। সবাই আজকে মেতে উঠেছে; আমরাও সে আনন্দের ভোজ থেকে বাদ পড়ি না।

জয়ন্তকে আজ নেমতন্ন করা হয়েছে, আগে থেকেই সে এসে অপেক্ষা করছে। দূর থেকে মিনুকে দেখে সে এগিয়ে আসে। মন্টুর ফুটবলটা হাতে নেয়, মিনুর দিকে চেয়ে দেখি—এতক্ষণ সে কথায় ফেটে পড়ছিল, কিন্তু জয়ন্তকে দেখার পর থেকেই কেমন যেন চুপ করে যায়। তার এই পরিবর্ত্তনটা আমার নজর এড়ায় না। মাথা নিচু করে বাড়ীতে ঢোকে মিনু।

আমার ছেলে মেয়েকে ভালবাসতাম—তাদের গৌরবে আমিও গৌরব বোধ করতাম। যে দিন আমার মন্টু পরীক্ষায় ফাষ্ট হল, সেদিন আমিও কম আনন্দ বোধ করিনি। ইস্কুল থেকে একগাদা বই নিয়ে এলো সে। লাল ফিতেয় বাঁধা প্রাইজ। কত আনন্দ তার। জয়ন্তও এসেছিল সেদিন। আমি বিশেষ পড়তে পারিনা, বই-গুলো নিয়ে নাড়াচাড়া করলাম শুধু। আমার সহকর্ম্মীদের শোনাতাম আমার ছেলের কথা—ছেলেকে পড়াতে আর মাইনে লাগবে না—পাশ দিয়ে সে ভাল চাকরী পাবে—আমার দুঃখের দোসর হবে। মনের চোখে দেখতাম সে বড় হয়েছে, ম্যানেজারের মত প্যাণ্ট কোট পরে ঘুরে বেড়াচ্ছে কলিয়ারীতে।

হাজিরী বাবুর ডাকে চমক ভাঙ্গে। উঠে বসি, কুলিকামিন গুলোকে বকে ঝকে আবার কাজে লাগাই।

বিন্দুর সাবধানী হিসাবে ও সাগ্রহ মমতায় আমার সংসার আনন্দে ভরে উঠল। সেদিন কলিয়ারীর বাবুরা কি যেন গানবাজনার আসর করেছেন। ম্যানেজার বাবুর ছেলে, কম্পাশবাবুর ভাইপো, ডাক্তার বাবুর ছেলে এবং আরও অনেকে একটা নাটক অভিনয় করল। মিনুকে নিয়ে গেছি দেখতে। বিস্মিত হয়ে যাই—মন্টু অভিনয় করছে! আমার মন্টু—তাকে আর চেনবার উপায় নেই। জয়ন্তই তাকে বদলে দিয়েছে, নাহলে আমার মত সামান্য একটা লোকের ছেলে এমনি

করে এত লোকের সামনে অভিনয় করবে—ওদের সবাইকে হারিয়ে দেবে—এ ভাবতেই পারতাম না। স্বয়ং ম্যানেজার একটা বড় মেডেল দিলেন তাকে। মিন্থর আনন্দ আর ধরে না। তাকেও মানিয়েছে চমৎকার। মন্থ, মিন্থ আর আমি······সেদিন ভেবেছিলাম—আমার মত সুখী আর কেউই নেই ; এত লোকের নজরের মধ্য দিয়ে মাথা উঁচু করেই আমি ওদের নিয়ে বার হয়ে এলাম।

হাজিরীবাবুর কথায় ফিরে চাইলাম। ছেলে মেয়েদের খাওয়াবার ব্যবস্থা হয়েছে বাইরে। তাদের সেখানে বসিয়ে আমাকে নিয়ে ভেতরে গেলেন। একটু বিস্মিত হয়ে যাই। কতকগুলো বোতল নামানো রয়েছে! গেলাসে ঢেলে নিজে একটা নিয়ে আর একটা আমার দিকে এগিয়ে দেন। চমকে উঠি—না-না, এ জিনিষ আমি ছুঁই না। কোনদিন ছোঁবনা।

বিস্মিত হয়ে যান হাজিরীবাবু।

"কি হল হে তোমার ?"

"না—না।"

একরকম বেগেই বার হয়ে আসি। এর ত্রিসীমানায় আমি থাকতে চাই না। বাইরে এসে মিন্থ আর মন্থকেও ডেকে নিয়ে বার হয়ে যাই। আমার এই পরিবর্ত্তনে তারাও বিস্মিত হয়ে ওঠে।

মনের মধ্যে একটা ঝড়—একটা আতঙ্ক, আমার অজ্ঞাতেই যেন ঘনিয়ে আসে।

পরদিন কাজে গেছি, হাজিরীবাবু একগাল হেসে বলেন—

"একেবারে কোন কাজেরই নও তুমি রতন !"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে চেয়ে থাকি তার দিকে। কাজের কোন ভুল ত্রুটি হয়ত বার হয়েছে। বলে চলেন তিনি—

—"বাড়তি পয়সাগুলো একটু খরচ কর হে—নাইলে যে মাথা গরম হয়ে যাবে। এই নাও এই সপ্তাহের এগার টাকা।"

টাকাটা ছুড়ে ফেলে দিতে ইচ্ছে করে। এমনি করে টাকা দিয়ে ওরা আমাকে অন্য জগতের প্রলোভনের পথের নিশানা দেখাবার চেষ্টা করে।

কিন্তু পরক্ষণেই ভাবি—কেন নেবো না?

হাত পেতে টাকাটা নিয়ে নীরবে কাজে চলে যাই।

বুড়ো কুলিটার পায়ে একটা কয়লার চাঁই পড়ে জখম হয়েছে। কত দিন ধরে ওই নিয়েই কাজে আসছে, না হলে তার সংসার চলবে না—বাড়ীতে স্ত্রী ছেলেমেয়ে রয়েছে। আমার মনটা যেন কেমন হয়ে যায়—আমার বাড়ীতেও আছে বিন্দু, মিন্থু, মন্থু।

পকেট থেকে টাকাটা বার করে বুড়োর হাতে দিয়ে দিই। বুড়ো বিস্মিত হয়ে যায়—"এত টাকা?"

তার এক সপ্তাহের রোজগার। চাইতে পারি না তার দিকে, বলি—"বলিস না কাউকে। নিয়ে যা তুই—ডাক্তার দেখাবি।"

সরে যাই।

হাজিরীবাবুকে সেইদিন থেকে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করি। তিনি কিন্তু নাছোড়বান্দা। আমার সই না হলে কুলির মাইনে আসবে না, তাই বোধহয় আমাকে চাইই তার দলে। বাধ্য হয়েই তিনি আমার সঙ্গে হৃদ্যতা রেখেছেন। সেদিনও একগাল হেসে তাকে আসতে দেখে সরে পড়বার চেষ্টা করি। এগিয়ে এসে একেবারে কাঁধে হাত রেখে বলে ওঠেন তিনি—

"ব্যাপার কি বলত হে? ম্যানেজার সাহেব তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আজ!"

একটু চমকে যাই। ম্যানেজার সাহেবের সঙ্গে সেদিন গানের আসরে দেখা হয়েছিল। আমি আর মিন্থু নমস্কার করতে তিনিও

একগাল হেসে নমস্কার করেছিলেন, মিনুর সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। আজ হঠাৎ ডাক কেন ?

হাজিরীবাবু বলেন—"বকশিস্ হলে ভাগ দিও ভাই! আমি কিন্তু তোমাকে ঠিক খবরা দিয়ে চলেছি।"

ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানাই। চিন্তিত মনে অফিসের দিকে এগিয়ে চলি—কে জানে কি খবর অপেক্ষা করছে সেখানে!

একমনে পাইপ টেনে চলেছেন ম্যানেজার জানলার দিকে চেয়ে। আমাকে ঢুকতে দেখেই বলে ওঠেন—"এসো!"

বলির পাঁঠার মত কাঁপতে কাঁপতে এগিয়ে চলি, চেয়ার ছেড়ে উঠে ম্যানেজার সাহেব পায়চারী করতে থাকেন। বেশ অনুভব করতে পারি—কথাটা বলতে তিনিও যেন একটু মনে মনে ওজন করে নিচ্ছেন।

—"হ্যাঁ, একটা চাকরী খালি আছে, তোমার মেয়েকে যদি চাকরীটা দিই—"

সাগ্রহে ম্যানেজার সাহেব আমার মুখের দিকে চেয়ে থাকেন, প্রলোভন দেখাতে থাকেন—

"আজকাল ত অনেক মেয়েই চাকরী করে, তাছাড়া কাজই বা এমন কি—মেয়ে কামিনদের দেখাশোনা করা। আমি ভাবছি আমার কলিয়ারী হবে একটা Ideal কলিয়ারী। মেয়েদের ক্যানটিন ইনচার্জের post একটা খালি আছে, দেখ তোমার মেয়ে যদি রাজী থাকে।"

চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকি—বিশ্বাসই করতে পারিনা আমার মেয়ে মিনু আসবে এই কলিয়ারীতে ওই কয়লার কালিতে কষধরা মেঝেন মালকাটাদের সর্দারণী হয়ে। মেঝেনদের চিনি, ওদের হাসি—ওদের মত্ত আহ্বান—ওদের লালসামাখা চাহনি—এই মূর্তিমান নরকে আমি

আমার ফুলের মত পবিত্র মেয়েকে আনতে পারব না। কিন্তু জবাবটা দিতে পারিনা মুখের ওপর। হাজার হোক মালিক—অন্নদাতা। তখনকার মত রেহাই দিলেন তিনিই—

"ভেবে বলতে হবে রতন, বাড়ীতে পরামর্শ করে উত্তর দিও।"

নমস্কার করে বার হয়ে আসি।

বাইরে আসতেই দেখি সাগ্রহে দাঁড়িয়ে আছে হাজিরীবাবু। একপাটি দাঁত বার করে এগিয়ে আসে—"কি বলল হে ?"

কোন জবাব দিই না। নীরবে এগিয়ে চলি। এরা সবাই শয়তান, ষড়যন্ত্র করে চলেছে আমার বিরুদ্ধে। রোজকার মত মিনু খাবার নিয়ে এসে আমাকে দেখেই চমকে ওঠে। ওর হাত থেকে খাবার নিয়ে তাড়াতাড়ি করে ওকে ছেড়ে দিতে পারলে যেন বাঁচি। ব্যগ্রলোলুপ শতদৃষ্টি যেন চারিদিক থেকে ওকে গ্রাস করবার জন্য উৎসুক হয়ে রয়েছে। আমার হাবভাব দেখে মিনু যেন টের পায়—

"কি হয়েছে বাবা ?"

"কিছু না, তুই সোজা বাড়ী চলে যা। ওদিকে নয়, এই পথ দিয়ে।

কলিয়ারী অফিসের পাশ দিয়ে না পাঠিয়ে তাকে আজ বনতুলসী ঝোপের মধ্য দিয়ে সোজা পথে বাড়ী পাঠিয়ে দিলাম। আজ আর বিশ্রাম করবার প্রশ্নই আসে না, উঠে গিয়ে আবার কাজে লাগলাম।

বাড়ী ফিরি। বাইরের মাঠে মনু আর মিনু ছুটোছুটি করছে। কলরব-মুখর মিনুকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। আমাকে দেখে দুজনে ছুটে আসে ওরা। অন্য দিন আমিও যোগ দিতাম ওদের আনন্দ কলরবে। আজ নীরবে বাড়ীতে ফিরলাম ওদের নিয়ে। ওরা বিস্মিত হল।

প্রথমে কথাটা কাউকে বলব না ভেবেছিলাম। ছাগল চুরির মত এই কথাটাও যেন আমার কলঙ্কের—আমার দৈন্যের পরিচয়ই দেবে—

তাই বলিনি। কিন্তু বিন্দুর নজর এড়ায়নি। সে জিজ্ঞাসা করে—"কি হয়েছে তোমার বলত? চুপচাপ রয়েছো?"

—"শরীরটা ভালো নেই।"

মাথায় কপালে হাত দিয়ে বিন্দু পরীক্ষা করতে থাকে—"রোদে কাজ, শরীর কি আর ভালো থাকে। মিন্থুকে ডেকে দিই একটু মাথা টিপে দেবে।"

মিন্থু!...প্রতিবাদ করে উঠি "না-না। ওকে ডেকো না।" বিন্দুর চোখে সন্দেহের ছায়া নামে, এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে—

—"কি হয়েছে বলত? আমার কাছে লুকিয়ো না।"

...সমস্ত ব্যাপারই প্রকাশ করি। শুনে বিস্মিত হয়ে যায় বিন্দু—"সেকি, মেয়ে যাবে চাকরী করতে ওই কুলি-কাবারির সঙ্গে? দরকার নেই ওতে!"

জবাব দেবার প্রতিক্রিয়া কি হবে তা জানতাম, তাই সহজে কথাটা বলতে চাইনি। সাবধান করে দিই—

"ওকে আর খাবার দিয়ে পাঠিও না। যা হয় খানকয়েক রুটি আমিই না হয় নিয়ে যাবো।"

জবাব দেবার পর থেকেই প্রতিক্রিয়াটা স্থরু হয়। ম্যানেজার সাহেব আশা করেছিলেন তাঁর কথা আমি মেনে নেব। কিন্তু জবাব দেওয়ার সময় দেখেছিলাম্ন তার চোখমুখের পরিবর্ত্তন, মুখের ওপর যেন একটা কালোছায়া ঘনিয়ে এলো। নীরবে বার হয়ে আসি।

হাজিরীবাবু শশব্যস্তে বলে ওঠেন—"তুমি একটা আকাট মুখ্যু রতন, এমন মৌকা ছেড়ে দিলে? চাই কি লোডিং বাবুও হয়ে যেতে হে। ভেবে দেখ।"

"হাজিরীবাবু!"

হাসতে থাকেন তিনি—"তুমি এখনো এ মাটিতে রপ্ত হওনি। যে

কজন বড় বড় মাথা রয়েছেন কলিয়ারীতে—খোঁজ করে দেখো তাদের আগেকার ঘটনাগুলো—এখনো ঘটছে। তুটো চোখ রয়েছে আগে পিছে, দেখতে শেখো ; এমন সব ঘটনা আখছার ঘটছে! কালো কয়লার রাজত্বে এসে মাথার চুল সাদা করে ফেললাম আমি—ওসব ঢের দেখেছি।"

রেগে বার হয়ে আসি। এসব নোংরামির মধ্যে থাকতে চাই না আমি।

তুপুর বেলায় সাইডিং-এ ম্যানেজার বাবুকে আসতে দেখে উঠে দাঁড়ালাম। তিনি এদিক ওদিক চেয়ে দেখতে থাকেন, কাকে যেন খুঁজছেন বোধ হয় ; আমাকে খানকয়েক রুটি চিবুতে দেখে এগিয়ে আসেন, বোধহয় মিন্থকে খুঁজছেন! ক্রমশঃ তার পরিবর্তনটা ফুটে ওঠে—

"কই তোমার কুলিকামিনরা কই ? এখনও লোডিং হলো না—আর তুমি দিব্যি বসে খেয়ে চলেছো ?"

—"হয়ে যাবে স্যার।"

—"কখন হবে ? এমনি করলে লোডিং হয় না।"

কথাগুলো বলে গট গট করে চলে যান তিনি। থ' মেরে দাঁড়িয়ে থাকি। মালগাড়ীর নীচে থেকে ভিজে বেড়ালের মত হাজিরীবাবু বার হয়ে আসেন—"কি হল হে ? ব্যাটা যেন সাপের পাঁচ পা দেখেছে আজ।"

হাতের শুকনো রুটি ক'খানা বিরক্তি ভরে ফেলে দিয়ে কুলিকামিন-গুলোকে ডেকে আবার কাজে লাগাই।

ক্রমশঃ অত্যাচারের মাত্রা বেড়ে চলে, অলক্ষ্য থেকে আসে আঘাত। কেন আসে তা বুঝি। মাল বোঝাই-এর কাজ থেকে আমায় বদলি করা হয় কলিয়ারীর নীচে।

সকাল বেলাতেই বয়লারের ভোঁ বাজবার সঙ্গে সঙ্গে হাতে কুপি ঝুলিয়ে পিটের নীচে নামি। সারাদিন বদ্ধ অন্ধকারে আর ভাপসা গরমে সেদ্ধ হয়ে কালিঝুলি মেখে উঠে আসি বিকালে! ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে টলতে টলতে এগিয়ে যাই বাড়ীর দিকে। মাঝে মাঝে ম্যানেজার সাহেব চেয়ে দেখেন, নমস্কার করলে ফিরেও চান না।

বিষিয়ে ওঠে কলিয়ারীর জীবন,…কুলি-সর্দারগুলো আমার কাজের অক্ষমতা দেখে হাসাহাসি করে, মেয়ে কামিনগুলো এ ওর গায়ে ঢলে পড়ে—আমার মন ওঠে বিষিয়ে।

কলিয়ারীর মধ্যে একটি লোককে আমার ভালো লেগেছিল সে ওই হাজিরীবাবু। এত দুঃখের মধ্যেও সে আমার খোঁজ খবর নিত।

বাড়ীর আবহাওয়া বদলে আসছে। সারাদিনের কঠিন পরিশ্রম আর মানসিক উৎপীড়ন আমার স্নেহার্দ্র মনকে ধীরে ধীরে কঠিন কঠোর করে আনছিল তিলে তিলে। সন্ধ্যার সে স্নেহনীড় ভেঙ্গে গেছে কোন কালে। মিনুও টের পেয়েছে, হয়ত আমার দুর্ভোগের মূল সে-ই। তাই নিজের মনেই সঙ্কুচিত হয়ে উঠি, লজ্জিত হয়ে উঠি তার আর আমার দুর্ভাগ্যে!

সেদিন সপ্তাহের মাইনে নিতে গেছি, ক্যাশঘরের জানালার পাশ থেকে মাইনে আসে—দশ টাকা কম। ক্লান্ত কালিমাখা চেহারাতে গর্জন করে উঠি—"কম কেন হবে আমার মাইনে ?"

—"অফিসের হুকুম। সরে যাও—গদাধর কুর্মি—আট টাকা তের আনা—বনমালী পোদ—বার টাকা।"

যথারীতি কাজ করে যায় ওরা। আমার মাইনে কমলে, আমার ছেলেমেয়ে উপোস দিলে ওদের কি আসে যায়! ওরা ত নির্বিকার থাকবেই!

বাড়ীতে পা দিয়েই মেজাজ খিচড়ে ওঠে—মন্টু তখনও ফেরেনি, সন্ধ্যা হয়ে গেছে। ফুটবল খেলতে গেছে শুনলাম। রাত্রি করে বেড়িয়ে ফেরা বাবুদের ছেলের মত।

সেই প্রথমদিন অনুভব করলাম আমি, আমার দারিদ্র—আমার অভাব অনটনের জন্যই আমাদের ছেলেমেয়েদেরও ভালভাবে বাঁচবার অধিকার নেই। দশটাকার অপমান আমাকে সেদিন উন্মাদ করে দিয়েছিল। আমার কঠিন পরিশ্রমে রোজগার করা সামান্য টাকায় ওরা বিলাসিতা করবে, নিশ্চিন্ত নির্ভরতার মধ্যে স্বাভাবিক জীবন যাপন করবে—ওদের ওই স্বস্তিটুকু আমার কাছে হয়ে উঠেছিল ঈর্ষার বস্তু। তাই মন্টু ফিরতেই সেদিন বাড়ীর বাইরে থেকে চুলের মুঠি ধরে তুলে এনেছিলাম তাকে। ঘা' কতক চড় চাপড় মেরে গর্জন করে উঠেছিলাম—

"লজ্জা লাগেনা? এতবড় ছেলে সংসার চলে কি করে, ভাবতে পার না? কাল থেকে যেখান হতে পারিস রোজগার করে আনবি, খেটে খাবি—আমি আর তোকে পুষতে পারব না।"

মিন্টু দূরে দাঁড়িয়ে থাকে; বিন্দু এসে ছাড়িয়ে নেয় তাকে। "কি করছ, দুধের ছেলে এ সবের কি বোঝে? একদিন গেছে খেলতে আর পাঁচটা ছেলের দেখাদেখি—আর যাবেনা।"

"পাঁচটা ছেলের সঙ্গে মিশলে আমাদের চলবেনা।"

মার খেয়ে কাঁদতে থাকে মন্টু। রাত্রে বিন্দু বলে "দুধের বাছা ওর কি সাধ যায়না ভালভাবে থাকতে, কি করব বল আমাদের বরাত... নাহলে এমনি হয়? তুমি ভেবোনা, এই মাইনেতেই চালিয়ে নেব কোন রকমে; বকোনা ওদের।"

দুঃখ কি একা বিন্দুরই—আমার কি হয়নি! আমার পিতৃ-হৃদয়ও কি বেদনায় মুচড়ে ওঠেনি সেদিন—হীরের টুকরো

ছেলেকে সহজ সুন্দর জীবনে বাঁচবার অধিকার দিতে পারিনি বলে। আমার দুঃখ—আমার অক্ষমতাই এর মূল। ওদের অপমান, ওদের দেওয়া বেদনাই আমাকে চোর করেছে—আমার পিতৃহৃদয়কে কঠোর স্নেহবঞ্চিত করে তুলেছে। একথা এখনও ভাবতে পারি বলেই বেদনায় অন্তর আমার মুচড়ে ওঠে। বিন্দু আমাকে জানাতে পারে তার দুঃখ, কিন্তু আমি আমার অন্তরের বোঝা লাঘব করবার কোন ঠাঁই ত' খুঁজে পাইনা ?

ও ঘর থেকে মন্থুর ফোঁপানির শব্দ ভেসে আসে। মিন্থু তাকে থামাবার চেষ্টা করছে, "ছিঃ এতবড় ছেলে কাঁদতে হয়—চুপ কর।"

মন্থুর কান্না কমে না। গায়ের ব্যাথা নয় মনের জ্বালাই মন্থুকে ব্যাকুল করে তুলেছে।

দারিদ্র প্রকট হয়ে ওঠে সংসারে। মন্থু স্কুলে যায়—পরণে তার ছেঁড়া প্যান্ট। বিন্দুর শাড়ী নেই বললেই চলে। মিন্থু যেন আমাকে এড়িয়ে চলে ; হাটবাজার যেটুকু না করলে নয়—তাই করা হয়। সেদিন কাজ থেকে বাড়ী ফিরছি—পিছন দিকে এসে শুনতে পাই বাড়ীতে হৈ চৈ চলেছে, মিন্থু আর মন্থু যেন গান গাইছে। জয়ন্তর হাসির শব্দ। বিন্দুও মাঝে মাঝে যোগ দেয় ; মনের গ্লানি যেন খানিকটা দূর হয়ে যায় আমারও।

কিন্তু বিস্মিত হয়ে যাই, বাড়ীতে পা দিতেই—সব যেন যাদুমন্ত্রের মত কোন দিকে উবে যায়। ওরা আমাকে কি ভাবে জানিনা। মূর্তিমান গ্রহের মতই আমাকে দেখে ওরা চুপ করে যায় কোন এক অনাগত ভয়ে, বিন্দুর হাসিও মুছে যায় ; কঠিন হয়ে ওঠে তার মুখ।

আমাকে ওরা এমনি করেই মন থেকে—অন্তর থেকে—ওদের প্রতি ভালবাসা থেকে তিলে তিলে নির্বাসিত করল। আমি যে ওদের বাঁচবার মত সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টি করে দিতে পারিনি !

আমার খাওয়া দাওয়ার পর বিন্দু আর মিন্নু খেতে বসে—হঠাৎ বাইরে আসতে ওরা একটু অপ্রস্তুত হয়ে যায়। হাঁড়িতে বা ওদের থালাতে মাত্র কটি ভাত, বাকী কি যেন শাকপাতা সিদ্ধর মত একটা পদার্থ। চমকে উঠি—"বিন্দু···"

বিন্দু মাথা নামায়। কোন রকমে খানিকটা জল খেয়ে নিজেকে সহজ করে তোলবার চেষ্টা করে। "শরীরটা আজ ভালো নেই" উঠে পড়ে বিন্দু। মিন্নু কি করবে খুঁজে পায় না।

নীরবে সরে আসি! এই আমি...আমি আবার অভিমান করি—শাসন করি ওদের। দাবী রাখি ওদের কাছে স্নেহ-প্রীতি-শ্রদ্ধার।

কি, কেন থাকবে ওই মিথ্যা দাবী। যাদের পরণে একখানা মোটা কাপড়—পেট পুরে দুমুঠো ভাত দিতেও পারি না, তাদের কাছে আমার কোন দাবী থাকতে পারে না। কোন অধিকার আমার নেই ওদের ওপর!

মিন্নু-বিন্দুর উপবাসক্লিষ্ট শুকনো মুখই আমাকে যেতে বাধ্য করিয়েছিল ওই ম্যানেজারের কাছে! ম্যানেজার সাহেব হাসেন আমার দিকে চেয়ে—কেমন জব্দ গোছের—বিজয় গৌরবের হাসি। জয় ওর হয়েছিল! মাথা আমি নোয়াতাম না, কিন্তু আমার মিন্নু—মন্নু—আর বিন্দুর উপবাসক্লিষ্ট মুখই আমাকে দুর্বল করে দিয়েছিলো!

মাথা নাড়েন ম্যানেজার বাবু—"আচ্ছা, ভেবে দেখি। পরে দেখা করো।"

ম্যানেজার সাহেব আমাকে যেন ল্যাজে খেলাবার চেষ্টা করেন। কারণে অকারণে হাজিরীবাবুকেও দেখি ম্যানেজারের ঘরের আশেপাশে যাতায়াত করেন।

...বিকালের দিকে পিট বটাম থেকে উঠে ডুলির বাইরে এসে নুড়ি পথটা ধরে বাড়ীর দিকে ফিরছি। হঠাৎ হাজিরীবাবুকে দেখে থামলাম, এগিয়ে এলেন তিনি।

"রতন আজ সন্ধ্যায় আমার বাসায় পুজো আছে, তুমি আসবে—ছেলেমেয়েকে নিয়ে।"

ঘাড় নেড়ে এগিয়ে চলি।

"আসবে কিন্তু, অনেক কথা আছে। ছেলেমেয়েদের নিয়ে এসো।"

হাজিরীবাবুকে হাতে রাখতে হবে। ম্যানেজারের সঙ্গে বিশেষ খাতির—তাছাড়া লোকে যে যাই বলুক আমি কোন খারাপ ব্যবহার পাইনি।

সন্ধ্যার পর মিন্নুকে নিয়েই ওর বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। মন্নুর পরীক্ষা—কম্পাসবাবুর বাড়ীতে পড়তে গেছে। কম্পাসবাবুর ছেলে নিজে এসে তাকে ডেকে নিয়ে গেছে। তাই মিন্নুকে নিয়েই এলাম।

রাস্তার ধারে ছোট নুড়ি পথ ধরে একটু এগিয়ে গেলেই হাজিরী-বাবুর বাড়ী। একটু বেশ ছিমছাম পরিষ্কার ধরণের। বাইরে একটু তরি-তরকারীর বাগানও আছে।

মিন্নু নীরবে আমার সঙ্গে চলেছে। এই ভেবে নিয়ে এসেছি তাকে—একটা দিন অন্ততঃ একটু ভাল খেতে পাবে। কালকের রাতে, শুধু কালকে রাতেই নয়, কদিন থেকেই একবেলার বেশী জোটেনি। আজ তবু একটু ভালমন্দ হয়ত জুটবে।

আসতে রাত হয়ে গেল, নিমন্ত্রিতেরা প্রায় সবাই চলে গেছে। কয়েকজন মাত্র রয়েছে, তাদেরও খাওয়া-দাওয়া হয়ে গেছে। শেষকালে গেলাম আমরা দুজন। হাজিরীবাবু সাগ্রহে নিয়ে গেলেন মিন্নুকে বাড়ীর ভেতরে, আমার সঙ্গে গল্প করতে বসলেন নিজে।

রাত্রি হয়ে আসছে, বাড়ীখানা প্রায় নির্জন; আকাশের কোলে একটা মেঘ ছেয়ে ফেলেছে আকাশখানা। মাঝে মাঝে বিদ্যুৎ চমকায়। পাহাড়ের কোলে কোলে ধ্বনি-প্রতিধ্বনি তোলে মেঘের ডাক।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ আর্তনাদ শুনে চমকে উঠি। মেঘের ডাক ছাপিয়ে

ভেসে আসে আমার মিনুর আর্ত্তনাদ……হ্যাঁ মিনু চীৎকার করছে। একটা গোঙানির মত আওয়াজ। লাফ দিয়ে সোজা হয়ে উঠি। সমস্ত শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় চঞ্চল রক্তস্রোত…বেগে বার হয়ে আসি। মিনু ছুটে আসছে—চোখে মুখে তার আতঙ্কের ছায়া। চুলগুলো ঝুলে পড়েছে, আঁচলটা লুটিয়ে পড়েছে মাটিতে।

"মিনু মিনু" —থমকে দাঁড়ালাম। মিনুর চোখে যেন বিদ্যুতের আভা—"তুমি আমাকে টেনে আনলে এই নরকে!" —কিছুই বুঝতে পারিনা।

"মিনু"

"না—না, ছুয়োনা আমাকে…"

বারন্দা থেকে নেমে অন্ধকারের মধ্যে ছুটে বার হয়ে পড়ে মিনু। আমি যেন স্বপ্ন দেখছি। হঠাৎ এপাশের বারন্দায় কাকে চীৎকার করে বার হয়ে আসতে দেখে সমস্ত ক্ষমতা আমার একত্রিত হয়ে ওঠে, সমস্ত ব্যাপারটাই পরিষ্কার হয়ে যায়। মদবিহ্বল কণ্ঠে চীৎকার করতে করতে এগিয়ে আসছে ম্যানেজার সাহেব স্বয়ং—

"হাজিরীবাবু ধরে নিয়ে এসো, ধরে নিয়ে এসো হারামজাদী ছুড়িটাকে।"

কি হয়ে গেল বুঝতে পারিনা। লাফিয়ে পড়ি ম্যানেজারের ওপর। উপর্যুপুরি কয়েকটা ঘুসি—হাতটা আমার তাজা রক্তে ভিজে যায়। হঠাৎ একটা আঘাত আমার মাথায়…চোখের সামনে বিদ্যুতের আলো—অন্ধকার হয়ে আসে। কোথায় যেন একটা বাজ পড়ল—তারপর কিছুই মনে নেই আর।

কথারম্ভ

—মিনতি—

সারা মনে আমার সেদিন ঝড় উঠেছিল, ধ্বংসের কোন সর্বনাশা ঝড় ! আমার সমস্ত দেহমন বিষিয়ে উঠেছিল ঘৃণায়-লজ্জায়-অপমানে !

বাবাকে ক্ষমা করতে পারিনি—নিশ্চয়ই বাবা জানত কেন আমায় সে নিয়ে চলেছে সেই শয়তানের রাজত্বে। এই সর্বনাশের পর—বাবার কাছে আর ফিরতে আমি চাইনি। সব স্বপ্ন—সব আশা আমার ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল। মাঝে মাঝে ভেসে ওঠে মনে—মনু আর মায়ের মুখ। পরক্ষণে বাবার কথা মনে আসতেই শিউরে উঠি! না-না-না বাবার আশ্রয়ে আর ফিরে যাবো না। সামনে আমার অতল অন্ধকার... আকাশে বিদ্যুতের আভা—বজ্রের গর্জন, তারই মাঝে আমি ছুটে চললাম—যদি কোন আশ্রয় পাই।

বৃষ্টির অঝোর ধারায় ভিজে নেয়ে উঠছি। ঝড়-বিদ্যুৎ-বজ্রপাত কোন কিছুই আমাকে ফেরাতে পারবে না। বাঁচতে হয় ভালো ভাবে আমার জীবনের সব স্বপ্ন সব আশা নিয়ে বাঁচবো—না হয় অতল অন্ধকারের মাঝে মৃত্যুর পথে চলে যাবো।

না—না...মরতে আমি চাই না, বাঁচতে চাই। আমার ভালোলাগা ধরণীর মাঝে, ছোট্ট স্বপ্ননীড়ের মায়ায় আমি বাঁচবো—। একদিনের ভুল আমার প্রতিদিনের সাধনায় ফুল হয়ে ফুটে উঠবে।

তেমনি দিনে একটি লোকের কথাই আমার মনে জেগেছিল যে আমার সমস্ত পাপ—সমস্ত কলঙ্ক ক্ষমা করে আমাকে হাত ধরে সঙ্গে নেবে।

প্রথম দিন থেকেই তাকে আমার ভালো লেগেছিল। বনতুলসীর ঝোপের মধ্য দিয়ে আসছি—সেদিন সেই ছিল আমাদের সঙ্গী। আমার পুটুলিটা নিজেই টেনে নেয় জয়ন্ত। চোখ চেয়ে দেখলাম···মিষ্টি হাসিভরা একখানা মুখ...আমার চোখের দিকে চেয়ে রয়েছে। ধীরে ধীরে মাথা নামিয়ে নিলাম। বনতুলসীর বিশ্রী ঝোপগুলো আমার চোখের সামনে যেন ফুলে ফুলে ভরে উঠল···জীবনে এই আমার প্রথম কোন পুরুষের নিকট সান্নিধ্য! অনুভব করি আমার দেহ মনের কোথায় যেন একটা সাড়া জেগেছে—যে সাড়া এতদিন আমার কাছে ছিল সম্পূর্ণ অজানা।

মাঝে মাঝে সন্ধ্যা বেলাতেও আসত জয়ন্ত··· বিকেলে গা ধুয়ে চুল বেঁধে সামান্য প্রসাধন সেরে বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকতাম। দূর রাস্তায় যেত-আসত কত লোক, আমার চোখ চেয়ে থাকত শুধু একজনের প্রতীক্ষায়।

"এত দেরী হল?"

"কাজ ছিল একটু।"

"কেবল কাজ আর কাজ।"

"মা কেমন আছেন, বাবা ফিরেছেন?···চল বাড়ীর ভেতর।"

বাগানে দু একটা গাঁদা ফুলের গাছ, ফুলে ফুলে ভরে রয়েছে; পাশে জয়ন্ত, তাকে আরও একটু কাছে আরও নির্জনে পেতে মন যেন ব্যাকুল হয়ে ওঠে। কোন দিকে কি হয়ে গেল বুঝতে পারিনা, জয়ন্তর হাতটা ধরে বলে উঠি—"দাঁড়াওনা একটু।"

সমস্ত শরীরে আমার কেমন যেন একটা আবেশ!

জয়ন্ত একটু বিস্মিত হয়ে আমার দিকে চায়। কতক্ষণ ছিলাম জানিনা হঠাৎ মন্টুকে আসতে দেখে সরে দাঁড়াই। মন্টুর হাত ধরে জয়ন্ত বাড়ীর ভেতরে চলে যায়। বিরক্তিতে ভরে ওঠে আমার মন, মন্টুটা যেন কি?

বার বার চেয়ে থেকেও আশা মেটেনা, মনে হয় এ যেন কি একটা নেশার ঘোর আমাকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। বার হয়ে আসছে জয়ন্ত। একগাদা ফুল নিয়ে বাড়ীর বাইরে দাঁড়িয়ে থাকি; তার হাতে দিতেই আমার মুখের দিকে চায়। চাঁদের আলোয় তাকে কত সুন্দর দেখাচ্ছে—যেন আমার স্বপ্নের রাজপুত্তুর!

"কি! এত ফুল?"

"আমার গাছের"

হাতের স্পর্শ পেয়েই তৃপ্ত থাকি, জানি—এর বেশী পাবার যোগ্যতা আমার নেই। তবু মন মানে না। প্রতিদিনের প্রতি কাজের মধ্যে একটি চিন্তা—একটি মুখ—একটি হাসি আমার সবকিছুকে আছন্ন করে রাখে!

মন মানেনা; কোন এক ফুলের রাজ্য, পাখীর ডাক আর ঝরণার কাকলিমুখর বনের সীমানায় আমরা দু'জন। সুরের ঝরণা। নীরব কণ্ঠে চেয়ে রয়েছে জয়ন্ত। আমার গানের সুরে বনের নীরবতা যেন ভাষা পায়।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে যায়—কোথায় সেই স্বপ্নদেখা বনরাজ্য, কোথায় বা জয়ন্ত। বিছানায় আমি একা...স্বপ্নের ঘোরে কোন্ মায়াজাল বুনে চলেছিল আমার ব্যাকুল মন। কত রাত জানিনা।

এমনি করেই আমার মনের সমস্ত দৈন্য—সব অভাব পূর্ণ করেছিল সে। পুরুষ জাতটাকেই ভাল বেসেছিলাম আমি এই জয়ন্তর মধ্য দিয়ে।

কিন্তু আমার ভুল ভেঙ্গেছিল সেদিন প্রথম যেদিন ম্যানেজারকে দেখি। লোকটার চোখের কি বিশ্রী চাহনি, আমার সমস্ত শরীর যেন ঝলসে দেয়। মাঝে মাঝে দেখতাম লোকটাকে, বাবার খাবার নিয়ে যাবার সময়। এক আধদিন আমার সঙ্গে সঙ্গে খানিকটা আসতও।

বাবাকে এসব কথা বলতে পারি না, চেষ্টা করেছিলাম জয়ন্তকে বলতে; কিন্তু কি করে বলা যায়? ম্যানেজারের কঠিন কঠোর দৃষ্টি, ওর লালসামাখা মুখ—জয়ন্তর হাসিভরা চাহনির কাছে নিষ্প্রভ হয়ে যেত। আমার মনে আমি যেন নিশ্চিন্ত নির্ভর একটু আশ্রয় পেয়েছিলাম জয়ন্তের কাছে। তাই ভেবেই ভালবেসেছিলাম তাকে। কোনদিন হিসাব করিনি জয়ন্ত আমাকে ভালবাসে কিনা, প্রয়োজন বোধ করিনি। আমি ভালবেসে তৃপ্তি পেয়েছি—নিশ্চিন্ত হয়েছি—এই আমার চরম পাওয়া।

মা যেদিন আমাকে বাইরে যেতে নিষেধ করেছিল, বুঝেছিলাম একটা কারণ ঘটেছে। বাবামায়ের মুখ ভার। সেদিন জয়ন্ত আসতে তাকে বলেছিলাম—"জানো আমি বড় হয়েছি, বিয়ের সম্বন্ধ হচ্ছে। শীগগীরই হবে বোধ হয়।

সেদিন দেখতে চেয়েছিলাম আমাকে হারাবার কল্পনা ওর মনে কোন ছায়াপাত করে কিনা। জয়ন্ত হেসে উঠল—"সত্যি নাকি? বর কি করে—বেশ হবে কিন্তু।"

জয়ন্তর কথায় ব্যথাই পেয়েছিলাম সেদিন। আমি চলে গেলে ওর বুকে কি একটুও দুঃখ বাজবে না? কে জানে!...

কদিন আসেনি জয়ন্ত। দুপুর বেলাতে একাই বেরিয়ে পড়ি, দরজার কাছে এসে ঠেলতেই দরজা খুলে যায়। ভিতরে গিয়ে দেখি শুয়ে রয়েছে জয়ন্ত। কপালে হাত দিতেই চোখ মেলে—"জ্বর?"

উঠে বসবার চেষ্টা করে সে—"ও কিছু নয়, একা এসেছ?"

"হ্যাঁ! খবর দাওনি কেন? কেমন আছো?" সারা মন ওর ব্যথায় ব্যাকুল হয়ে ওঠে।

"একা আসা ঠিক হয়নি। দুদিন পর বিয়ে হচ্ছে—এ সব কি ভালো দেখায়? ছি!"

…মন আমার গুমরে ওঠে। বিয়ে!—রহস্য করে কি একটা কথা বলেছি সেই মুখের কথাই হল বড়, আমার মনের ব্যথা-ব্যাকুলতার কোনই দাম রইল না। রাগে দুঃখে অভিমানে চোখ ফেটে জল বার হয়ে আসে আমার। কেন ওর কি কোনই দাবী নেই আমার ওপর? আমাকে কি কোন প্রয়োজনই নেই?

উঠে পড়ি! চোখের জল বাধা মানে না, বেগে বার হয়ে আসি—পিছনে জয়ন্তর ডাক কানে আসে—

—"মিনু-মিনু!" আমি তখন পথে নেমে পড়েছি! কোন দিনই আর আসবো না—কথাও বলব না—কক্‌খনো না—বলব না কোন কথা!…চোখের জলে অন্ধকার হয়ে আসে আমার পথ!

কিন্তু শপথ রাখতে পারি কৈ! বাড়ীর অবস্থা খারাপ হয়ে আসছে! বাবার মাইনেও কমে গেছে, বাবার সামনে যেতে পারি না! কেমন যেন সর্বদাই কি ভাবছে! দু'বেলার আহার্যেও অনটনের স্বাক্ষর চিহ্নিত হয়। সব কিছু দুঃখ—সব কিছু অনিশ্চয়তার মাঝেও ফুটে ওঠে একটু নির্ভর, জয়ন্তর মুখখানা। সেদিনও সে এসেছিল। ব্যাকুল হয়ে উঠেছিলাম অনেক দিন আসেনি বলে, ভয় হয়ত বা হারাবো তাকে, মিছে অভিমানে ওকে হারাবার দুঃখ আমার সইবে না। সেদিন আসতে নিজের বদ্ধ মনের আগল খুলে খুসীর জোয়ারে ভরে দিয়েছিলাম তাকে।

কিন্তু কে জানত এমনি করে আমার আশা কল্পনা সব চুরমার হয়ে যাবে!

বাবার সঙ্গে যেতে মন চায় নি। বাবা বললেন—একটু ছিমছাম হয়ে নে, ভদ্র সমাজে যেতে হবে, একটু সাজসজ্জা না হলে চলবে কেন?

আমার সাজগোজ করবার উদ্দেশ্যটা যদি জানতাম, তাহলে নিশ্চয়ই যেতে চাইতাম না—যা হবার হতো।

আকাশের কোনে একটুকরো মেঘ। মাঝে মাঝে চমকে উঠছে বিদ্যুতের আভা। মেঘ ডাকছে, কতক্ষণ বসে আছি জানি না—আলো আঁধারের ঝিলমিলিতে হঠাৎ দেখা যায় একখানা মুখ...লালসামাখা বিহ্বল চাহনি ভরা একখানা বিভীৎস মুখ... শিউরে উঠি আতঙ্কে...

এগিয়ে আসছে ম্যানেজার—আর্ত্তনাদ করে উঠি! দুরন্ত পশু, ওর কঠিন বাহু-বন্ধনের দুর্বার চাপে আমাকে পিষে ফেলতে চাইছে। নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে, সর্বাঙ্গ জ্বলে ওঠে একটা অগ্নি জ্বালায়! ওর উষ্ণ নিশ্বাসে ও আমাকে ঝলসে দিতে চায়। চীৎকার করে উঠি—অব্যক্ত ভাষাহীন সে চীৎকার। আমার সমস্ত শক্তিকে পাশবিকতায় সে যেন নিঃশেষ করে দিতে চাইছে।

প্রাণপণ শক্তিতে হাতে কামড়ে দিতেই শিথিল হয়ে আসে ওর বাহু বন্ধন—লাফ দিয়ে বার হয়ে পড়ি।

বাবাকে দেখে শিউরে উঠি! আমার বাবা—এতদূর বয়ে এনেছে আমাকে এই শয়তানের হাতে তুলে দিতে। আশ্রয় কোথায় তার কাছে? অতল অন্ধকারের বুকে বার হয়ে পড়ি যদি আশ্রয় পাই।

বৃষ্টিতে নেয়ে উঠেছি। আমাকে দেখে জয়ন্ত বিস্মিত হয়ে যায়। সে কল্পনা করতে পারেনি এমনি অবস্থায় এই সময়ে আমাকে দেখবে। আজ কোন লজ্জা—কোন ভয় আমার নেই। আমাকে বাঁচতে হবে, শয়তানের লোলুপ দৃষ্টির অন্তরালে থেকে নিজেকে বাঁচাতে হবে! বাঁচবার দুর্বার আগ্রহ আমাকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

জয়ন্তকে সব কথা বলতে পারিনি, বলা সম্ভব নয়। তাই প্রথমে সে আমাকে বাড়ীতেই দিয়ে আসতে চেয়েছিল।

"আমার কাছে আশ্রয়ের জন্য এসেছ—কিন্তু সেটা কি তোমার কলঙ্কের কথা নয়?"

"যে কলঙ্ক—যে অপমানের হাত থেকে আজ ফিরে এসেছি—তার চেয়ে অনেক কম।"

"কি বলছ মিনু ?"

"সে কথা কি না শুনেই থামবে না। যেটুকু অপমান আমার বাকী আছে তাও পূর্ণ হোক এই তুমি চাও ? বেশ—"

সব ঘটনাই তাকে বলেছিলাম। জানিয়েছিলাম—আজ যদি আশ্রয় না দাও, আমাকে আর কোনদিনই কেউ দেখতে পাবে না। কলিয়ারীর অতল অন্ধকারে ঝাঁপ দেওয়া—এই কলঙ্কের বোঝা বওয়ার চেয়ে অনেক সোজা।"

আমার চোখের জল হাসির আভায় ঝিলমিল করে উঠেছিল। জয়ন্ত আশ্রয় দিয়েছিল আমায়। কিন্তু—বিনিময়ে তাকে ছেড়ে যেতে হল তার আশ্রয়।

কোথায় কোন অজানার মধ্যে বাসা বাঁধতে হবে আমাদের। হোক না অজানা, তাকেও জেনে সহজ করে নেব। নির্জন রাতের অন্ধকারে তারার আলোয় আমরা যাত্রা করলাম দুটি প্রাণী—জয়ন্ত আর আমি। কোথায় যাচ্ছি জানি না, তবু খুসির জোয়ার আমার মনের সব কালিমা মুছে দিলো। জয়ন্তর হাতখানা ধরে এগিয়ে চললাম।

মায়ের কথা—মনুর কথা মনে পড়ে। মনু কাঁদবে, মা দুঃখ পাবে, বুক ভেসে যাবে ওর। তবু দূর থেকেই—তোমাকে প্রণাম করে গেলাম মা! কোন কাজে এলাম না তোমাদের। বাবার বোঝা হয়েই ছিলাম—আজ সে বোঝা থেকে মুক্তি দিয়ে গেলাম তোমাদের। আমার জন্য কোন অপমান, কোন দুর্ভোগ আর তোমাদের সহ্য করতে না হয়। মনু—মনু ভাই! তোর দিদিকে ভুলিস না। হয়ত ঘৃণায় লজ্জায় মাথা হেট হয়ে আসবে তোর—দিদির এই ব্যবহারে। কিন্তু কেন আমি এই আঘাত তোকে দিতে বাধ্য হলাম, সে খবর কেউ পৌঁছে দেবে কি তোর মনের দরজায় ?

—মনু—

মায়ের কান্নার ডাকে ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসি! মায়ের কণ্ঠে একটা আর্তনাদ—! অস্পষ্ট আলোয় দেখি, বাবা দরজা ধরে দাঁড়িয়ে রয়েছেন, কপালের পাশে সারা মুখে চাপ বেঁধে রয়েছে, থানা থানা রক্ত, একটা চোখ ঢেকে গেছে! মা কেঁদে চলেছে—

"কোথায় কোন শয়তানের হাতে তুলে দিয়ে এসেছো আমার মেয়েকে ?"

"আমি ভাবতে পারিনি বিন্দু!"

"সব জানতে তুমি! তুমি জেনেশুনেই মেয়েকে নিয়ে গিয়েছিলে—"

বাবা আর্তনাদ করে ওঠে—

"এত নীচ হয়ে যাইনি আমি, বিশ্বাস কর তুমি। নিজের হাতে নিজের মেয়েকে—"

"সব বিশ্বাস আমার ভেঙ্গে গেছে—যেখান থেকে পারো মেয়েকে নিয়ে এসো—"

দেখলাম—বাবার চোখে মুখে কি একটা দারুণ হতাশার ছায়া! বাবা বার হয়ে গেলেন! এমনি অবস্থায় বাবাকে কখনও দেখিনি। মায়ের দয়ামায়া নেই, না হলে বাবাকে এমনি আহত অবস্থায় যেতে দিত কখনো! মায়ের অজ্ঞাতেই বিছানা থেকে উঠে বার হয়ে যাই, বাবা আর দিদির খোঁজে!

অন্ধকার ফিকে হয়ে আছে। বৃষ্টির পর ভিজে মাটির বুকে একফালি চাঁদের আলো লুটিয়ে পড়েছে। নিঝুম দিগন্তের বুকে ঢেউ খেলান উচু নীচু পাহাড়ী পথে ছুটে চলি—বাবা, বাবা!

কোন সাড়া নেই, আমার ব্যাকুল আহ্বান নির্জন রাতের বুকে ধ্বনি প্রতিধ্বনি তুলে আবার আমার কাছেই ফিরে আসে।

দিদি কোথায় গেছে আমি খানিকটা ভাবতে পারি। হয়ত জয়ন্তদার ওখানে। ছুটে চলি বনতুলসীর জঙ্গল ভেদ করে—পাহাড়ী পথ ধরে।

হঠাৎ একটা শব্দ...সমস্ত শরীর আমার রোমাঞ্চিত হয়ে ওঠে। পাশ দিয়ে ছুটে বার হয়ে যায় একটা শিয়াল—চোখ দুটো ওর নীলাভ আলোয় ঝক্‌ঝক করছে।

থমকে দাঁড়িয়ে দম নিয়ে আমার সমস্ত শক্তিসাহস একত্রিত করে আবার ছুটে চলি। দিদিকে খুঁজে বার করতেই হবে, বাবার রক্তমাখা মুখখানা—মায়ের কান্না আমার চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমার ভয় মিলিয়ে যায়।

জয়ন্তদার বাড়ীটার কাছে এসে নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে হাঁফ ছেড়ে দাঁড়িয়ে বদ্ধ দরজায় ধাক্কা দিতেই দরজাটা খুলে যায়—ঢুকে আবার থমকে দাঁড়াই। সব অন্ধকার—কেউ কোথাও নেই!

দিদি, জয়ন্তদা কেউ নেই—কাউকেই দেখতে পাই না। ঘরগুলো ফাঁকা, জিনিষপত্র এলোমেলো করা—আমার সমস্ত পরিশ্রমই ব্যর্থ হয়ে গেল। অন্ধকার জনহীন রাতে এতখানি পথ ছুটে এসেছিলাম যে দুর্ব্বার আকর্ষণে, সে উৎসাহ আর আমার নেই। রাগে দুঃখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে আমার মন। দিদি জয়ন্তদা সবাই আমাকে ফেলে চলে গেল!

দিদি জানল না ওরই জন্য কি অবস্থা হয়েছে বাবার, মায়ের মনে বেজেছে কত দুঃখ—সবাইকে ছেড়ে ওরা চলে গেল।

যাক···কোন দিন যেন আর ফিরে না আসে। কোন প্রয়োজন নেই আমাদের, আমি ওকে চিরদিনের জন্যই ভুলবার চেষ্টা করব।

তবুও কেন বার বার মনে পড়ে দিদিকে! শূন্য হয়ে গেছে ঘরখানা। চোখের সামনে ভেসে ওঠে বার বার—তার গানের সুর তার মুখ। মায়ের সজল চোখের দিকে আর চাইতে পারিনা, ছেঁড়া জামা আমার আর সেলাই করা হবে না। বাবা তখনও ফেরেনি, মায়ের মনে একটু সান্ত্বনা দেবার জন্যই মায়ের কাছে এসে বসি। মা মুখ ফিরিয়ে থাকে, জোর করে মায়ের চিবুকটা ধরে নিজের দিকে টানতে থাকি—ডাকি "মা!"

বাইরের দরজায় হঠাৎ কাদের পায়ের শব্দ—কড়ানাড়ার শব্দ পেয়ে উঠে যাই; "একি!" আর্তনাদ করে উঠি—বাবাকে ধরাধরি করে নিয়ে এসেছে কয়েকটা লোক—মুখে একটা তীব্র গন্ধ তার, জড়িত কণ্ঠে চীৎকার করছে বাবা—

"শালা শূয়ারকা বাচ্চা! এ্যাই ছেড়েদে, ছেড়েদে আমাকে, শালাদের মুণ্ড নিয়ে তবে আমার দম! শালা ম্যানেজারের এত হিজ্জত—আমারই সর্ব্বনাশ করবে—আবার বলবে মাতালকে চাকরী থেকে বরখাস্ত করলাম।"

মাথায় ময়লা একটা ন্যাকড়া বাঁধা, রক্তে ভিজে উঠেছে। চীৎকার করে চলেছে জড়িত কণ্ঠে। দাঁড়াবার সামর্থ নেই, পা টলে পড়ছে।

চিরকাল ঘৃণা করে এসে এসেছি যাদের মাতাল বলে, আজ সেই শ্রেণীতে নেমে গেল এমন একটি লোক—যাকে সব চেয়ে বেশী ভাল বেসেছি—শ্রদ্ধা করেছি এতদিন ধরে। নিজের এই পরাজয়ে—এই অপমানে সেদিন প্রথম আমি কেঁদেছিলাম।

প্রশ্ন করেছিলাম নিজের মনে—কেন এমন হল? স্নেহ মায়া প্রীতি দিয়ে ভরপূর মানুষ আমার বাবা কেন আজ এই সর্ব্বনাশের পথে

নেমে এল? এর জন্য দায়ী কি ওই একা? কখনোই নয়—তাহলে আরো আগেই সে নেমে আসত ওই পথে; বাইরের জগতকে চিনি না, জানি না—তাই হয়ত বাবার এই অধঃপতনের কারণ সঠিক জানতে পারিনি তখন।

বাবাকে যারা অধঃপতনের পথ দেখাল, তারা শুধু বাবারই শত্রু নয়, শুধু আমাদেরও শত্রু নয়—আমাদের শ্রেণীর সকলের শত্রু। তারা দলে এক আধজন নয় শতসহস্র—সর্বত্রই তারা ছড়িয়ে আছে। তাদের মনগড়া শ্রেণী থেকে আমাদের নির্বাসিত করবার জন্য ওৎপেতে আছে তারা।

আমার ছোট্ট পৃথিবীতেও তাদের সংখ্যা কম ছিল না। তারাও বিকৃত করে তুলল আমার সুন্দর সাধের এই জীবন যাত্রাকে—আমি এর আগে ঘৃণা করতে জানতাম না, ওরাই প্রথম শেখাল আমাকে ঘৃণা করতে—আঘাত হানতে।

স্কুলে গেছি,—ক্লাশের অনেক ছেলের আক্রোশ ছিল আমার ওপরে, অপরাধ আমি ফার্ষ্ট হই, প্রাইজ পাই—তাদের নায্য অধিকারে আমি কেন ভাগ বসাই?

মালকাটাদের ছেলেরা পথের ধারে কয়লা কুড়োতো, তারাও আমাকে বই নিয়ে স্কুলে যেতে দেখে হাসত—হিংসাই করত বোধ হয়—তারাও যেন আজ আমাকে অপমান করতে পেলে ছাড়ে না—আমার একটা দুর্বলতা—আমার একটা দৈন্যের খবর তারা পেয়েছে। কয়লায় কালিমাখা ছেলেটা এগিয়ে এসে বলে—

"বিড়ি আছে?"

"না খাইনা।"

ছেলেগুলো হেসে ওঠে—"তোর বাপ মদ খায়—আর তুই বিড়ি খাস না? মিথ্যুক কোথাকার!"

এগিয়ে যাই, মনকে সান্ত্বনা দিই এই বলে—ওরা আমাকে ওদের শ্রেণীরই একজন ভাবতে চায়, কিন্তু না, আমি তা নই।

টিফিনের সময় ছেলেরা নানা রকমের খাবার খায়, আমি সরে যাই সেখান থেকে। কয়েক আঁজলা জল খেয়ে পেটের জ্বালা থামাবার চেষ্টা করি; থামেও খানিকটা। পেছন থেকে কয়েকটা ছেলের হাসির শব্দে চমকে উঠি, আমার প্যান্টের ফাটা জায়গাটাতে আঙ্গুল দিয়ে টানাটানি করছে তারা, তাদের হাত ছাড়িয়ে ঘুরে দাঁড়াই। ক্লাসের ভোঁদামত ছেলেটা প্রথম দিন থেকেই আমার সঙ্গে ফাজলামী করে, আজ বলে উঠে—"তোর দিদি কার সঙ্গে পালিয়েছে—নারে ?"

কে যেন বলে উঠে—"প্রেম !"

দিদিকে ঘৃণা করি,—কিন্তু কি অধিকার আছে ওদের আমার দিদিকে অপমান করবার। কেন তা সহ্য করব। সমস্ত শক্তি একত্রিত করে মোটা ছেলেটার নাকে একটা ঘুসী বসিয়ে দিই। ওদের দলের সবাই আমার ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে। কতক্ষণ ধ্বস্তাধস্তি চলেছিল অনুমান করতে পারি না—কর্ত্তামাষ্টার এসে ছাড়িয়ে দেন। কপালটা আমার ফুলে উঠেছে, চোখে পড়েছে কালসিটে, জামাটা ছিড়ে কাঁধের কাছে ঝুলছে। আমার একটা মাত্র আস্ত জামা। দিদি নেই, ও আর সেলাইও হবে না। কান্না আসে চোখ ভরে—মারের বেদনায় নয়, লজ্জায় অপমানে, দিদির উপর না জানা অভিমানে।

স্কুল থেকে ফিরে আসছি, ছেলেরা সবাই আমার দিকে চায় কি যেন ওরা বলাবলি করে হাসাহাসি করে। মাথা নীচু করে শতছিন্ন জামাটা গায়ে চোরের মত এগিয়ে আসি। গলিপথ ধরে ওদের এড়িয়ে যাবার চেষ্টা করি। আমার দারিদ্র—বাবার ব্যবহার

মাতাল বদনামের জন্য চাকরী যাওয়া—দিদির পালানো সবকিছুর বোঝা আমার উঁচু মাথা নীচু করে দেয়।

হঠাৎ একটা সোনারূপার দোকানের সামনে এসে থমকে দাঁড়াই! মা—হ্যাঁ মাইত, একটু ঘোমটা দিয়ে আব্রু রাখবার চেষ্টা করছে, কিন্তু আমার মাকে আমি শত আব্রুর মাঝেও চিনে নিতে পারি। পুরোনো একটা মোহর বিক্রী করতে এসেছে মা।

মাকে দেখা দিইনা—এড়িয়ে চলে যাই, কিন্তু দূর থেকে দেখেছিলাম, লক্ষীর ঝাপির মোহর—শেষ সম্বল ওই টুকু বার করতে মায়ের বুকের পাঁজরা কেঁপে উঠেছিল। দোকানদার মায়ের হাতে তুলে দেয় মাত্র কয়েকটা টাকা, ও জানে না কত চোখের জলে কত পূর্বপুরুষের সিন্দুরের স্পর্শে ওর দাম কত বেশী ওই গোটাকতক টাকার তুলনায়।

বাবার চাকরী নেই, ম্যানেজার সাহেব বরখাস্ত করেছেন। বাবা নাকি ম্যানেজারকে অপমান করেছিল। আমি বুঝতে পারি—হয়ত দিদির চলে যাওয়া নিয়ে আমাকে যেমন আমার স্কুলের ছেলেরা অপমান করে তেমনি হয়ত ওরাও বাবাকে অপমান করেছিল। কিন্তু পরিণামটা টের পাই দুদিনেই, সন্ধ্যা বেলাতে বাবাকে বাড়ীতে দেখিনা, মা ব্যস্তসমস্ত হয়ে কি যেন খোজাখুঁজি করছে। জিজ্ঞাস করতেই মা তালাভাঙ্গা তোরঙ্গটা দেখিয়ে বলে ওঠে—

"ওরই মধ্যে কটা টাকা ছিল কে নিয়ে গেছে মনু ?"

"টাকা ?"

মায়ের চোখে জল আসে। আমি থ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকি। ওই সামান্য কটা টাকা কোথা থেকে এসেছিল জানি, কি দাম দিয়ে মা নিয়ে এসেছিল ওই টাকা। মা কখনও বাইরে যায়নি—সেই মা আমার গিয়েছিল হাটের দোকানে। বিক্রি করে এসেছে

পূর্বপুরুষের লক্ষ্মীশ্রী ওই মোহর—আর নিজের এতদিনের সম্মান। সামান্য কটা টাকা মাত্রও নয়—-ওর দাম অনেক।

রান্না হয়না, মায়ের অলক্ষ্যে রান্নাঘরে ঢুকে দেখছি হাঁড়িতে চাল নেই একটি দানা! আমার হাতে একটা দুয়ানি দিয়ে মা বলে—

"মুড়ি কিনে খেয়ে আয়। আজ রাতে আর রাঁধতে পারছি না—শরীরটা ভালো নেই।"

—"তুমি?"

মা বিরক্ত হয়ে ওঠে—"বললাম শরীরটা ভালো নেই—আমি খাবনা কিছু।"

"চিড়ে মুড়ি খেলে কিছু হয়না।" বেরিয়ে গেলাম দোকান থেকে চিড়ে মুড়কী নিয়ে আসতে।

ময়রার দোকানে আমার খাতির ছিল একটু। ময়রার খাতাপত্র লিখে দিতাম, তাই জিনিষপত্র সে আমাকে বেশীই দিত। দু-আনার চিড়ে মুড়কী অনেক দিয়েছে। মায়ের আমার দুজনেরই ভাগে পড়বে চাট্টি করে। বাড়ীর কাছে এসেই থমকে দাঁড়ালাম। —মা বলে চলেছে—

"কেন চুরি করেছ ওই টাকা, জানোনা কি করে সংসার চালাই? নিজেরা না হয় উপোস দিয়েই কাটালাম—ওই দুধের ছেলে ওর মুখে একমুঠো ভাত দিতে পারিনি আজ—আর তুমি টাকাটা নিয়ে উড়িয়ে দিয়ে এলে; মিনু গেছে বেঁচে গেছে।"

বাবা জড়িত কণ্ঠে গর্জ্জন করে ওঠে—"চোপরাও।"

"লজ্জা লাগেনা তোমার এমনি করে ওদের মুখের গ্রাস কেড়ে নিয়ে মদ খেতে—"

"খবরদার"

মায়ের কথা বন্ধ হয়ে যায় একটা তীক্ষ্ণ আর্ত্তনাদে, উপর্যুপরি

কয়েকটা আঘাত···আমি আর থাকতে পারিনা, দরজাটা ঠেলে ঢুকে পড়ি। মা উঠোনের এক কোনে পড়ে গেছে—বাবা লাথি মেরে চলেছে তাকে—আমাকে ঢুকতে দেখেই থমকে দাঁড়াল বাবা; চোখাচোখি হতে আমার দিকে এগিয়ে আসে। মাকে এমনিভাবে মারতে কোনদিন দেখিনি, মায়ের কান্না আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করেছিল সেদিন।

বাবা আমার হাত থেকে মুড়ি মুড়কির ঠোঙ্গাটা তুলে নিয়ে খোলা দরজা দিয়ে বার হয়ে গেল নীরবে। মায়ের দুঃখ আমাকে মুড়ি মুড়কির কথা ভুলিয়ে দিয়েছে...ছুটে গিয়ে মায়ের পাশে বসলাম। আমার হাতের স্পর্শ পেয়ে মা নীরবে আমার দিকে চাইতে থাকে, আঁচল দিয়ে চোখের জল মোছবার চেষ্টা করে।

কোন কথা বলবার ক্ষমতা আমার নেই, মায়ের চোখে সে রাত্রে যে ব্যাথা বেদনা ফুটে উঠেছিল আমি তা অনুভব করেছিলাম সবটুকুই!

দিদি নেই। ভাবনাত একা আমার জন্য। আমি পারব নিজেকে বাঁচিয়ে রাখবার মত রোজগার করতে, মায়ের দুমুঠো ভাতও দিতে পারব; রাত্রে বেলায় মাকে বলতে যাই, বাধা দিয়ে ওঠে মা—"যেদিন পাশ করবি মন্টু আমার দুঃখ সেদিন ঘুচবে।"

এযুক্তি মানতে পারিনা; মায়ের দুঃখ কতটুকু। দিনান্তে দুমুঠো অন্ন—মায়ের মুখে তাই তুলে দিতে আমায় এতবৎসর ধরে অপেক্ষা করে সাধনা করতে হবে। না যেটুকু বড় হয়েছি তাতেই আমি পারব মায়ের দুঃখ দূর করতে। মাকে এভাবে মার খেতে দেব না। মায়ের এই অপমান অসহ্য।

আমার পথ আমি খুঁজে পাই, মাকে বলিনা, মা হয়ত উপোস দিয়েই মরবে তাহলে। এতদিন এক বেলাই খেয়ে এসেছে তবু বলেনি; ওরা

তিলে তিলে সন্তানের জন্য স্বামীর জন্য উপোস দিয়ে মরতে পারে···কোন প্রতিদানের প্রত্যাশা রাখেনা।

রাত্রি কত জানি না, একফালি চাঁদের আলো এসে মায়ের অশ্রু-ক্লিষ্ট মুখে পড়েছে...বড্ড ভালোলাগে মাকে···মাগো···তোমার পাশে দাঁড়াবার মত একজন আজও আছে—যে তোমাকে কোনদিন...কোন-দিনই ছেড়ে যাবে না!···

বাবার কাছে পেয়েছ দুঃখ—আর নির্যাতন, কিন্তু তোমারই রক্ত-মাংসে গড়া তোমার সন্তান—সে তার সমস্ত শক্তি দিয়ে তোমার দুঃখের অবসান করবে। ছোট্ট দুটো হাত আমার, কোন দুর্বার শক্তিতে অসীম শক্তিময় হয়ে ওঠে!

···মতলব আমি রাত্রেই ঠিক করে রেখেছিলাম। যথারীতি বই খাতা নিয়ে স্কুলে বার হয়ে গেলাম, কিন্তু কালকের স্কুলের ঘটনা—আর মায়ের এই অবস্থা দেখে ইস্কুলে যাবার প্রবৃত্তি আর হয় না, রোজগার করতে হবে, মাকে আমাকে বাঁচতে হবে, অতল সমুদ্র থেকে তীরে পৌঁছতে হবে প্রথমে, লেখাপড়াটা আমার মত হতভাগার কাছে বিলাস বলেই মনে হয়।

মন্টুয়ার দোকানে বইখাতাগুলো রেখে সোজা পথ বয়ে কলিয়ারীর পিটের মুখে দাঁড়ালাম, বুড়ো আঙুলে ভর দিয়ে যতদূর সম্ভব নিজেকে লম্বা করে দমভোর নিশ্বাস নিয়ে বুক ফুলিয়ে নিজেকে খাটিয়ে মরদ বলে পরিচিত করবার চেষ্টা করছি। টাইমবাবু খাতাতে নাম লিখে চলেছেন...

—"বয়স কত।"

—"আঠারো"—বুক কেঁপে ওঠে: কিন্তু মিছে কথা না বললে চলবে না! টাইমবাবু বলে- "আঠারো! নেংটি ইঁদুরের মত হয়ে আছিস আজও।"

—"নাম লিখতে পারিস ?"

মাথা নেড়ে জবাব দিই···"না। টিপছাপ দিতে পারি।" ব্যস ! আজকের মত চাকরী আমার হয়ে গেল।

মাটির অতলে ট্রলি লাইনের ওপর দিয়ে কয়লা ভর্তি টবগুলো ঠেলে নিয়ে যাওয়া। প্রথম প্রথম একটু কষ্ট হয়—পরে ব্যাপারটা বুঝতে পারি, টইটুম্বুর বোঝাই টবগুলো থেকে আরও দু' একজনের দেখাদেখি ভারি কয়লা কতকগুলো ফেলে দিয়ে খানিকটা হালকা করে দিব্যি ঠেলে নিয়ে যাই ! ব্যাটা ওভারম্যান টের পেলেই যাতা বলে গালিগালাজ করে—কিন্তু টের পেলে ত ?

গাড়ী ঠেলে নিয়ে চলেছি—হঠাৎ দেখি মালকাটাদের সেই ছেলে-গুলো, যারা আমাকে স্কুলে যেতে দেখত। ওদের সঙ্গে খেলতামও না—মিশতামও না। আজ হঠাৎ আমাকে তাদেরই মত খাদের নীচে কাজ করতে দেখে প্রথমে বিস্মিত হয়ে যায়। সর্দার মত ছোঁড়াটা এগিয়ে আসে—

"কিরে পাশ করে ম্যানেজারী করতে এসেছিস নাকি রে ?"

আর একটা ছেলে আমার পিছনে একটা গোঁত্তা দিয়ে বলে ওঠে "জোরসে—"

পিছন ফিরে তাকে একটা ঘুঁসি বসিয়ে দিতেই ওরা জোর করে আমাকে ধরে কয়লার টবের মধ্যে পুরে দেবার চেষ্টা করে, বাধা দিই হাত পা ছুড়ে—কিল চড় মেরে, কিন্তু ওদের সঙ্গে পেরে উঠি না। কালো একটা টবে নামিয়ে দিয়ে আমাকে ওরা জোরসে ঠেলে নিয়ে চলে।

কান্না ঠেলে আসে আমার বুক থেকে।

দুনিয়ার সর্বত্রই কি এই অত্যাচার—অক্ষমের উপর বলবানের জোর ! বাবাকে ওদের ক্ষমতাই মাতাল, পশু ক'রে তুলেছে। আমাকে বিতাড়িত করেছে স্কুল থেকে, জীবনের সহজ সুন্দর অধিকার

থেকে নির্বাসিত করেছে এই নরককুণ্ডে—পঙ্কিল জীবনের মাঝে। সেখানেও রেহাই নেই—

কিন্তু আজ এখান থেকে চলে গেলে না খেয়ে মরতে হবে; কত দুঃখ, কত দৈন্যের জন্য আজ এইখানে আশ্রয় নিয়েছি। কিন্তু শেষ আশ্রয়ও কি আমার চলে যাবে! মায়ের দুঃখ কি দূর করা হবে না!

কলিয়ারীর গ্যালারীর এক কোণে বসে বসে কাঁদছি, ফোঁপানির শব্দ অন্ধকারে ছড়িয়ে পড়ে। হঠাৎ পিছন থেকে কার হাতের ছোঁয়া পেয়ে চমকে উঠি! সেই সর্দার মত হুদো ছেলেটা—

"কাদছিস তুই? ধ্যাৎ, নে! চিবো।"

তার পকেট থেকে কয়লার ধূলো মাখা দুখানা রুটি বার করে দেয়। ক্ষিদেতে নাড়ী জ্বলছে, নোব কি না ভাবছি। নিজেই হাতে করে কয়লার ময়লা ঝেড়ে এগিয়ে দেয়—

"নে, খা। শোন, ইখানে কান্না ফান্না চলবে না, কেউ শালা বললে তাকেও শালা বলবি, চড় মারলে লাথি মারবি, দেখবি কোন শালা আর তোর কাছে এগোবে না।"

চিবোতে থাকি ওর রুটিখানা, ছেলেটাকে ঠিক চিনতে পারিনি, বলে চলে সে—

"তোর বাবার চাকরী খেয়েছে শালা ম্যানেজার, আর আমার বাবাকে কি করেছে জানিস?"

সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তার মুখের দিকে চেয়ে থাকি। বলে ওঠে সে—

"বাবাকে জ্যান্ত কবর দিয়েছে এই কলিয়ারীর নীচে! ধ্বসে আটক পড়েছিল আমার বাবা, আরও অনেক লোক, শালারা কলিয়ারীর মুখ বন্ধ করে দিলে, তুলতেই এলো না তাদিকে।"

রুটি চিবিয়ে খানিকটা জল খেয়ে পকেট থেকে একটা বিড়ি বার

করে দেশালাই ধরিয়ে জলন্ত কাঠিটা আসমানে ঘুরপাক দিতে দিতে বলে—"কি মনে হয় জানিস ? আমরা ত কুকুর বিড়ালের জাত, জানের দাম কি ? শালাদের লাখ লাখ টাকার কলিয়ারী—গ্যাসের মধ্যে দেশালাই জ্বেলে একবারে উড়িয়ে পুড়িয়ে দিই। কিন্তু শালাদের বরাত বড় জোর, দেখনা জলন্ত কাঠিটাই নিভে গেল।"

ওর মুখের দিকে চেয়ে থাকি ! কি যেন জ্বালা—আগ্নেয়গিরির মত জ্বালা বুকে নিয়ে ঘুরছে।—ওরা আমারই মত ভাগ্যের পরিহাসে এসেছে রুটির ধান্ধায়। স্কুলের ছেলেরা আমাকে শুধু পরিহাসই করেছে—আঘাতই দিয়েছে—ওরা আমায় ঘৃণাই করেছে। কিন্তু এরা, এদের অশিক্ষিত মনের সরলতার জন্য আঘাতও করেছে, পরক্ষণেই আমার দুঃখের ভাগী হয়ে নিজের আঘাত জর্জরিত মনের সমস্ত পরাজয় ও দুর্ভাগ্যের কাহিনী শুনিয়ে আমাকে আপন করে নিয়েছে, ভালবেসেছে! এতদিন এদের চিনিনি, দূরেই সরিয়ে রেখেছিলাম। আজ যেন আপন করে পাই এদের দলকে।

দিনের শেষে কাজ করে উঠে আসছি। ছেলেটা বলে—

"কাল আসবি তো ?"

"যদি কাজ দেয়।"

গর্জে ওঠে সে—"দেবে না মানে ? টাইমবাবুর মাথা কয়লার চাঁই দিয়ে চ্যালা করে দোব না।"

একজন বলে—"আমাদের দলে এসে দাঁড়াবি, তারপর দেখব টাইমবাবু কি বলে।"

একটা টাকা! এই আমার জীবনের প্রথম রোজগার। মনে হয় এই দিয়েই আমাদের সারা জীবনের সব অভাব মিটে যাবে। বুড়ো আঙ্গুলের একটা আঘাত দিতে কাঁপতে কাঁপতে টাকাটা শূন্যে উঠে আবার হাতের মধ্যেই ফিরে আসে···বেশ মিষ্টি সুরেলা একটা শব্দ।

সারা দিনের খাটুনী আমার সার্থক হয়েছে, আরও যদি দেয় এখুনিই গিয়ে আবার কাজ করতে পারি এমনই মনের অবস্থা।

আসছি, হঠাৎ নাথো ধাওড়ার সামনে পচাই মদের দোকানের কাছে এসে বাবার ডাকে চমকে উঠলাম। বাবা! প্রথমটা দেখে চিনতে পারিনি। কয়লার ধূলোতে সর্বাঙ্গ কালো হয়ে গেছে। কাপড়খানা ছিঁড়ে পায়ের কাছে ঝুলছে। চোখ দুটোতে কি একটা দারুণ রুক্ষতা। কালকের রাত্রের সেই ছবিখানা ভেসে ওঠে,—মা আর্তনাদ করছে, ওই লোকটা লাথি মেরে চলেছে,—কে ও আমার?

—"টাকা কোথায় পেলি? দে-বলছি!"

মুঠো শক্ত করে ধরি, পালাবার যোগাড় করতে বাবা ধরে ফেলে; মোচড় দিয়ে আমার হাত থেকে টাকাটা কেড়ে নেবার চেষ্টা করে। প্রাণপণে বাধা দেবার চেষ্টা করি—

—"না-না! দোব না, কিছুতেই দোব না—"

মা—মায়ের কান্না ভরা মুখখানা আমাকে শক্ত করে তোলে, কিন্তু প্রচণ্ড একটা চড় খেয়েই মাথা ঘুরে যায়, হাতের মুঠি আলগা হয়ে আসছে, চোখের সামনে কেমন যেন সব অন্ধকার। বাবা টাকা কেড়ে নিয়ে ওপাশের মদের দোকানে ঢুকে পড়ে বিজয় গর্বে। দাঁড়িয়ে থাকি...

চোখের জলে ঝাপসা হয়ে আসে সব। সব পরিশ্রম আমার ব্যর্থ হয়ে গেল! মা...মায়ের মুখে তুলে দেবার মত কিছুই নিয়ে যেতে আমি পারলাম না!

...ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে বাড়ী ফিরেই আলো নিয়ে পড়তে বসি, ভয় হয়, মা হয়ত কিছু টের পেয়েছে। ঘুমে চোখ ছেয়ে আসে। কখন ঘুমিয়ে পড়েছিলাম জানি না, মায়ের ডাকে ঘুম ভাঙ্গে। বাবা তখনও ফেরেনি। বাবার কথা মনে আসলেই আজ একটা বিজাতীয় ঘৃণার সঞ্চার হয়।

চোখে মুখে জল দিয়ে খেতে বসি। দেখি কোথা থেকে মা চাল যোগাড় করে এনে ভাতই দিয়েছে।

"তোমার—?"

"আছে-রে।"

বিশ্বাস হয় না—মুখ ফিরিয়ে নিই।

"না তুমি শুদ্ধ খাও, এতেই হবে দুজনের। নাহলে খাবই না।"

সে রাত্রে সেই ভাত দুজনে ভাগ করে খাই। অনিচ্ছা সত্ত্বেও কয়েক গ্রাস খেতে হল মাকে। মা বলে ওঠে—"কাল বাইরের দরজায় তালা দিয়ে দুপুরে নোতুন পাড়ায় একটু দিদির ওখানে যাবো।"

বিস্মিত হই—"তোমার দিদি?"

"নারে এমনি পরিচয় হয়েছিল আগে। কাল যাবো ওদের বাড়ীতে।"

ভালোই হল। কাল তাহলে আমি স্বাধীন। মাকে এড়িয়ে আর কাজে যেতে হবে না, মাথা তুলেই কাজে যেতে পারবো।

পরদিন কলিয়ারীর কাজটা আমার কাছে অনেক সহজ বোধ হয়। একা সত্যিই কষ্ট হয়, কিন্তু আমি ছেলেগুলোর সাহায্য পেতাম, ভোদা ছেলেটা আজও রুটি খাওয়ায়। দেখলাম দলের সবাই তাকে মানে, ভয়ও করে। সময় অসময় সে যাকে তাকে যথেচ্ছভাবে চড়চাপড়টা জমিয়ে দেয়, অবহেলা ভরে একটা বিড়ি ধরিয়ে দিয়ে আবার মারের প্রতিদানও দেয়।

আজ আর সোজা পথে যাই না, কাল বাবার হাতে তুলে দিয়েছি টাকাটা আজ আর তা হবে না, বাঁকা পথে অনেক দূর ঘুরে ময়নার দোকান থেকে বইপত্তর নিয়ে ফিরি। হাতের মুঠোয় আস্ত একটা টাকা...রাজ্য জয় করেই যেন ফিরছি আজ।

মা সবে ফিরে বাড়ীর কাজ কর্ম্ম সুরু করেছে। বিস্মিত হয়ে যাই

কোথা থেকে মা আজও চাল ডাল আলু নিয়ে এসেছে। কে জানে ও পাড়ার দিদির কাছে হয়ত চেয়ে না হয় ধার করে এনেছে। আমি রোজগার করছি—কিন্তু মাকে সহজে টাকাটা দিতে ভয় পাই, কে জানে আমার কলিয়ারীতে মালকাটা জীবন কাটানোর সংবাদের চেয়ে উপোস দেওয়া—ভিক্ষে করা হয়ত মায়ের কাছে অনেক সোজা। ব্যথা পাবে তাই দিতেও পারি না।

সেদিন কলিয়ারীতে যথারীতি কাজে গেছি, দুপুরের দিকে ওভ্যারম্যানের চীৎকারে গ্যালারীর আড় থেকে একটু ব্যাপারটা দেখতে যাই। একটি মেয়েকে যেন বকছে সে।···কারবাইডের লণ্ঠনের এক ঝলক আলোয় মেয়েটিকে দেখেই চমকে উঠি! ভারি টবগুলো ঠেলতে পারছে না সে, ওভারম্যান অশ্লীল ভাষায় গালাগাল দিয়ে চলেছে তাকে —"না পারিস তবে ছিনেল্গী করতে আসা কেন ?"

কয়লার কালো ছোপে মুখ-চোখ ঢেকে গেছে মেয়েটির—হাফাচ্ছে। —ওভারম্যানের বকাবকিতে টব ঠেলবার চেষ্টা করে। আমি দাঁড়িয়ে থাকি, কিন্তু সর্বাঙ্গ যেন জ্বলতে থাকে আমার। একটা কয়লার চাঁইএর ঘায়ে ওই জানোয়ারটার মাথা চ্যালা করে দিতে পারলে যেন শান্তি হত।

কাজ করতে এসেছে মা—আমার মা! আমাকেই দুমুঠো খাওয়াবার জন্য সম্মান—জীবন সব কিছু বিপন্ন করে এসেছে এই নরকের মধ্যে।

কোন দিকে কি হয়ে গেল। আমাদের সাজান সংসার, দিদি, বাবা —আমাদের শান্তিময় জীবন সব ছারখার হয়ে গেল। কয়লার কালো কষের উপর চোখের জল গড়িয়ে পড়ে!

সামলে নিই নিজেকে। হ্যাঁ—আমি আবার সব ফিরিয়ে আনব। কেন নয়? টব ঠেলতে ঠেলতে খানিকটা এগিয়ে গেছে মা, আমিও এগিয়ে যাই।

অন্ধকার গ্যালারীর মধ্য দিয়ে মা চলেছে টবটার উপর ঝুয়ে পড়ে। অস্পষ্ট অন্ধকারে শুনতে পাই মায়ের ফোঁপানির শব্দ। শরীরের সমস্ত জোর দিয়ে সে প্রাণপণে ঠেলে চলেছে, আমি গিয়ে আর একদিকে মাথা নীচু করে হাত দিয়ে টবটা ঠেলতে থাকি।

টের পেয়েছে মা। টের পেয়েছে কে যেন তাকে সাহায্য করতে এসেছে। শরীরের সমস্ত শ্রান্তি আমার কেটে যায়, মায়ের একখানা হাত আমার হাতে এসে ঠেকে। মা যেন সমস্ত ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করছে আমাকে।

গ্যালারীর মুখে এক ঝলক বিদ্যুতের আলোয় আমার মুখের দিকে চেয়েই আঁৎকে ওঠে মা! আমাকে না জানিয়ে কাজ করতে এসে ধরা পড়ে যাবার লজ্জার চেয়ে মায়ের মুখে চোখে ফুটে ওঠে আমার কাজ করতে আসার ব্যাপারটা! স্বপ্নেও ভাবেনি মা —আমি আসব এই পাতালপুরীতে কয়লার টব ঠেলতে।

"মনু!···তুই ?"

মায়ের দুটি কথায় রাজ্যের বিস্ময় আর হতাশা পুঞ্জীভূত হয়ে ফেটে পড়ে। জবাব দিই না—শুধু মায়ের দিকে চেয়ে থাকি। মা কোন কথা বলবার আগেই বীরদর্পে মায়ের কয়লার গাড়ীটা ঠেলে এগিয়ে নিয়ে চলে যাই। আজ আর কে কি ভাবল দেখবার সময় নেই, বাঁচতে হবে। আর বাঁচবার পথ সামনে যা পেয়েছি সেই কাজ করতেই হবে আমাদের।

দলের নতুন বন্ধুদের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিলাম মায়ের। নিঃশেষিত প্রায় বিড়িটাতে একটা সুখটান দিয়ে রেলগাড়ীর মত একরাশ ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে লালু বলে—"তোর মা ?"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানাই।

বিড়িটাকে ছুড়ে ফেলে দিয়ে সে বলে—"তাও ভালো, আমার শালা ওসব পাট চুকে গেছে—মাও নেই—বাবাও অক্কা!"

আর একটি ছেলে প্রশ্ন করে—"এক ধাওড়াতেই থাকিস ?"

'হ্যা!" বিস্মিত হয়ে যাই—মাকে ছেড়ে কখনও ছেলে থাকে নাকি ? ছেলেটা বলে চলে—"তোর মা ভালো বলতে হবেক। আমার মাটো বাবার সাথে ছোড়ছাড় করে কুথাকে চলে গেইছে।"

মা ওদের কাছে কামনার বস্তু। অনুভব করি ওদের জীবনে সম্পদ স্নেহ প্রীতির কোন সংস্পর্শই নেই। মা বাবার স্নেহ ওদের কাছে বিলাস। দুবেলা দুমুঠো খেতে পাওয়া ওদের কাছে ভাগ্যের পরিচয়। পৃথিবীর নীচে খনির অতলে যে বিরাট একটা অন্ধকারময় জগৎ আছে এদের—তার চেয়েও অন্ধকার এদের জীবন। সে যে আরও কত অন্ধকার সেদিন আমি বুঝেছিলাম।

প্রশ্ন এসেছিল—কারা এদের জীবনের আশার বাতিগুলি সব নিবিয়ে দিয়েছে, কারা বিষিয়ে দিয়েছে এদের পৃথিবীর বাতাস—কারা নামিয়ে দিয়েছে এদের পশুত্বের পর্যায়ে ?

কেন ? কেন—এরা সব হারিয়ে, পৃথিবীর সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়ে থাকবে ?—জবাব মেলেনি সেদিন।

মা কিন্তু আমার বন্ধুদের মেনে নিতে পারেনি, বলে—

"ওদের সঙ্গে মিশিস না মনু, ওরা বদমাস—গুণ্ডা।"

মায়ের কথার জবাব দিইনি—মনে মনে হেসেছিলাম শুধু। মা জানে না আমি যখন স্কুলে পড়তাম বড় লোকের ছেলেদের সঙ্গে, তখন তারা আর আমাদের সমাজ আমাকে শিখিয়েছিল—ওরা গুণ্ডা বদমাস চোর, কিন্তু আজ আমি চিনেছি ওদের—পেয়েছি ওদের অন্তরের পরিচয়! আমি জানি, ব্যথায় দীন পৃথিবীর সবকিছু থেকে বঞ্চিত হয়েও নীরবে ওরা সব অপবাদ মেনে নিয়েছে। মেনে নিয়েছে এই নির্ব্বাসন দণ্ড!

কোন ধাপ্পায় আমি ভুলব না।

কেন?—কেন ওরা করে না কোন প্রতিবাদ! কেন করে না বিদ্রোহ!

মায়ের ভুলও ভাঙবে।

কাজের পর উঠে আসছি, মাকে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। গ্যালারীর দেওয়াল ধরে ধরে হাঁপাচ্ছে। কোনো কঠিন কাজ করেনি কখনও। ঘামে ভিজে গিয়েছে সর্ব্বাঙ্গ। ধরে বসিয়ে দিলাম মাকে।

"মা···মা!"

ক্লান্ত পরিশ্রান্ত মায়ের মুখে এক ঝিলিক মলিন হাসি ফুটে উঠল—"নারে ও কিছু নয়! একটু জল।"

জল কোথা পাই এই পাতালে। হঠাৎ দেখি লালু—পাশেই ছিল সে, ছুটে গিয়ে একটা দলের গোটা কেনেস্তারা ভর্তি জলটা ঝগড়া করেই নিয়ে আসে। কে একজন বাধা দেয়—"এ্যাই"

লালুর কণ্ঠও গম্ভীর শব্দে গর্জন করে—"চোপ বে!"

বিজয় গর্বে সে জলের ক্যানেস্তারাটা এনে নামিয়ে দেয়—"লে জল!"

মুখে চোখে দিয়ে এক ঢোক জল খেয়ে মা যেন খানিকটা সুস্থ হয়। ব্যাকুল মায়া ভরা চোখে মায়ের দিকে চেয়ে এগিয়ে আসে লালু।

—"প্রথম প্রথম মাটির নীচে এমনি দম লাগে, ওসব ঠিক হয়ে যাবে!"

মা—অতীতের স্মৃতি ভেসে আসে, সেই ঘর—গোলা ভরা ধান—লক্ষীর মত আমার মা! কোথায়—কোনদিকে সব ভেসে গেল! আজ মা এসেছে কয়লা বইতে দুমুঠো অন্নের জন্য! চোখদুটো অশ্রুসজল হয়ে আসে। পাছে মা দেখতে পায় তাই মুখ ফিরিয়ে নিই। মায়ের এই কষ্ট সেদিন আমার বুকে কি যে বেজেছিল প্রকাশ করবার ভাষা আমার নেই।

উপরে এসে বাড়ীর পথ ধরলাম ; দুজনেই নীরব। জোরে হাঁটতে পারছে না মা। এক দিনের হাড়ভাঙ্গা খাটুনি আধমরা করে দিয়েছে মাকে।

একটু পিছিয়ে পড়েছে মা। আপন চিন্তায় বিভোর হয়ে এগিয়ে আসছি আমি। হঠাৎ একটা ডাকে মুখ তুলে সামনে চাইলাম—বাবা। ধুলো আর কয়লার কষ চুলে জট পাকিয়ে মাথাটাকে বাবুইএর বাসায় পরিণত করেছে। কাপড় জামাতে কালো কয়লা মাটির ছাপ। গালে একগাল কাঁচা পাকা দাড়ি—কয়েকদিন কামান হয়নি। আমার বাবা—এগিয়ে আসছে আমার দিকে !

...একটা মূহূর্ত্ত !

আমার মনের সমস্ত তন্ত্রীতে আঘাত হানে বিগত দিনের কথা ! ও আমার দিনান্তের পরিশ্রম লুটে নিয়েছে। আমাকে নামিয়ে এনেছে দিনমজুরের পর্যায়ে। মা—আমার সব চেয়ে যে বড় বেশী ভালবাসার তাকে সেদিন কুকুরের মত লাথি মেরেছিল। আজ কলিয়ারীর গ্যালারীতে বিবর্ণ কাতর মায়ের মুখখানা আমার চোখে ভেসে ওঠে। না—কিছুতেই না। এত কষ্টের রোজগার, আমাদের ভবিষ্যৎ, আমাদের সম্মান এই পয়সা ওকে দোব না। শক্ত সতেজ হয়ে ওঠে আমার মন। রাস্তার একটা পাথর তুলে নিয়ে ফিরে দাঁড়াই। পালাবো না—প্রতিরোধের চেষ্টা করব আজ।

—"দে টাকাটা।"

—"না।"

চিলের মত ছোঁ মেরে এসে বাবা আমার উপর পড়ে। বাধা দিই—"ছেড়ে দাও, ছেড়ে দাও আমাকে।"

কঠিন হাতের একটা চড়ে আমার মাথাটা ঘুরে যায়, হাত থেকে টাকাটা ছিটকে পড়ে যায় মাটিতে। বাবা কুড়িয়ে নিতে যায় টাকাটা।

কোন দিকে কি হয়ে যায় বুঝতে পারি না। নিজের দিকে চেয়ে দেখি…রক্তে রঞ্জিত হয়ে গেছে জামাটা, হাতের পাথরটা দিয়ে বাবার কপালে উন্মত্ত হয়ে উপর্যুপরি কয়েকটা চোট বসিয়েছি! ধারাল পাথরটার মুখেও বেশ খানিকটা রক্ত।

বাবা পিছিয়ে যেতেই টাকাটা তুলে নিলাম, বাবার দিকে চেয়ে অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে উঠি। অতর্কিতে পাথরের আঘাত খেয়ে বাবা সরে গিয়েছিল, মাথা তুলতে দেখি—কপাল গড়িয়ে পড়ছে রক্ত, কয়লার কালো কষের ওপর দিয়ে চুঁইয়ে লালচে রক্ত পড়ছে মাটির বুকে! বাবার চোখে আগুনের আভা, স্থির বিভৎস দৃষ্টিতে আমার দিকে এগিয়ে আসছে।

হঠাৎ দেখি—সেই চাহনি কেমন যেন নিষ্প্রভ হয়ে যায়, অস্ফুট একটা আর্তনাদ বার হয়ে আসে বাবার কণ্ঠ থেকে—"তুমি! তুমিও এসেছ বিন্দু কলিয়ারীতে কাজ করতে?"

মাথা তুলে দেখি মা—খানিকটা পিছিয়ে ছিল, আমাদের ধ্বস্তাধস্তির সময়ে এগিয়ে এসেছে। বাবা সামনে সাপ দেখার মত চমকে উঠে… পিছন ফিরেই বেগে চলে গেল নাথো ধাওড়ার দিকে, এক দণ্ডও দাঁড়াল না, যেন পালাতে পারলে বাঁচে।

মা পাথরের মূর্তির মত নীরবে দাঁড়িয়ে রয়েছে, দুই চোখে তার অশ্রু! নিজের এই দৈন্যময় জীবনের জন্য না স্বামীর বেদনায়—বুঝলাম না। সারা শরীর আমার অবশ হয়ে আসছে, পায়ের নীচে থেকে মাটি সরে যায়, অস্বাভাবিক একটা উত্তেজনা……হাতের পাথরটা ছুঁড়ে ফেলে দিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরি, কোমল শীতল একটা শান্তির নিবিড় স্পর্শ, কান্নায় ফুলে ফুলে ওঠে আমার দেহ। সমস্ত উত্তেজনা আমার চোখের জলের বন্যায় ফেটে পড়ে। না কাঁদলে আজ আমি হয়ত পাগলই হয়ে যাবো।

এতদিনের স্নেহপ্রীতি ভালবাসা দিয়ে গড়া আমাদের সংসার এক মূহূর্ত্তে একটা পাথরের ঘায়ে যেন চুরমার হয়ে গেল। আমি যেন আজ সবকিছুই হারালাম। তাসের ঘর ধুলোয় মিশিয়ে গেল। কিন্তু এ না করে আমি পারিনি। বাবার রক্তে হাত রাঙ্গিয়েছি। কিন্তু কতবড় ব্যথাবেদনায় আমার সারা অন্তর রঙ্গীন হয়ে উঠল কেউ তা বুঝবে না।

হাত ধরে মা আমাকে বাড়ীতে নিয়ে এল।

সেরাত্রে আমি খেতে পারিনি, ঘুমও আসেনি। মা কেমন স্থির গম্ভীর। মায়ের মুখের দিকে চাইতে পারি না। নিজেকে যেন অপরাধী মনে হয়। মা, মা হয়ত সত্যিই আমাকে ঘৃণা করে। লালুর সঙ্গে মিশতে নিষেধ করেছিল, ওরা নাকি গুণ্ডা, ওদের সঙ্গে মিশে আমিও যে একটা গুণ্ডা হয়ে গেছি মা হয়ত তাই ভেবেছে। না হলে বাবাকে এমনি করে মারতে পারি, কিন্তু মা জানেনা আমি লালুর কাছে ও শিক্ষা পাইনি। মায়ের দুঃখই আমাকে উন্মাদ করে দিয়েছিল। মা কি সেকথা বিশ্বাস করবে? বার বার চীৎকার করে জানাতে ইচ্ছা করে—বিশ্বাস করো মা, আমি এখনও নীচ জানোয়ার হয়ে যাইনি, আজও বেঁচে আছি। ভালভাবে বাঁচতে চাই, আর চাই বলেই বাবার ওই বদ স্বভাবকে প্রশ্রয় দিইনি, বাধা দিয়েছি। যে কেউ আমাদের জীবনে বাধা হবে তাকেই আঘাত করব; সে যেই হোক।

কিন্তু কথাটা মাকে জানাতে পারিনা, বিছানায় শুয়ে শুয়ে গুমরে উঠি। কখন চোখ বুজে এসেছিল জানি না, হঠাৎ ওঘরে কার কথা শুনে ঘুম ভেঙ্গে গেল। বাবার কণ্ঠস্বর! মাকে ব্যাকুল ভাবে কি যেন বলছে। একটু বিস্মিত হলাম বাবার পরিবর্ত্তনে।

সন্তর্পনে বিছানা থেকে উঠে দরজার পাশে এসে দাঁড়ালাম। অন্ধকারে আমাকে দেখাই যায় না।

বাবা বলে চলেছে—"তুমি কাজ করতে যেওনা বিন্দু। আমাদের সাত পুরুষে কেউ যায়নি ওখানে···ওখানে গেলে মানুষ আর মানুষ থাকেনা—জানোয়ার করে তোলে ওরা।"

"না গেলে চলবে কি করে?"

"যেমন করে হোক আমি চালাবো, যেখান থেকে হোক কাজ খুঁজে নোবই।"

মা নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে। অস্পষ্ট আলোতে দেখি বাবার কালো রক্তের দাগ শুকিয়ে জমাট বেধে রয়েছে। মুখে চোখে ক্লান্তির আভা, তবু চোখ দুটোতে আগেকার মতই কোন স্নেহ প্রীতির পসরা। ছুটে গিয়ে জড়িয়ে ধরে কাঁদতে ইচ্ছে করে, কিন্তু পারিনা।

খাটের ওপর বাবা বসে রয়েছে, ভিজে ন্যাকড়ায় করে মা রক্তের ছাপ মুছিয়ে দেয়। অলক্ষ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছি আমি। ওদের জগতে আমার প্রবেশাধিকার নেই আজ। মা বলে ওঠে—

"খুব লেগেছিল না? তিনজায়গায় কেটে গেছে। কি দস্যি হয়েছে, সত্যি তোমাকে মারার পর ওর কান্না দেখোনি···সেকি কান্না!"

বাবা কথা বলেনা, কি যেন ভাবছে!

"ম্যানেজারকে ধরে করে যেমন করে হোক চাকরী আমি আবার জুটিয়ে নেব। তোমাদের দেখে আমি নিজেকে শক্ত করেছি বিন্দু, কাজ আমার চাইই। এইভাবে আর নিজেকে শেষ করে দিতে পারি না।"

"খেয়ে যাও"

নিজের ভাতগুলোই বোধ হয় মা বাবাকে ধরে দেয়। মায়ের চোখে কি যেন তৃপ্তির আভা। এক মুহূর্ত্তের জন্য আবার আমার মনটা যেন অতীতের স্বপ্নে ভরে ওঠে। আগেকার সেই সহজ সুন্দর জীবন।…আবার কি ফিরে আসবে সেই হারানো দিনগুলো!

খানিকক্ষণ পরেই বাবা বার হয়ে গেল; রাত্রিবেলাতেই বাবা ম্যানেজারের সঙ্গে দেখা করবে।

ভোর বেলা দরজায় কাদের ডাক শুনে ধড়মড় করে উঠে পড়লাম। মা তখনও ঘুমুচ্ছে। মাকে না জাগিয়েই দরজা খুলে দেখি ধাওড়ার অনেকেই এসেছে। মাও উঠে আসে। খবরটা শুনেই চমকে উঠি। পা'টা যেন কাঁপছে। মা কেঁদে ফেলে—আমি চীৎকার করে উঠি—"না—না কিছুতেই হতে পারে না, সব মিছে কথা।"

আমি বিশ্বাস করতাম এই সংবাদ যদি না কাল রাত্রে বাবাকে দেখতাম! কালরাত্রে দেখেছিলাম তার মুখচোখের পরিবর্ত্তন; মানুষের মত বেঁচে থাকবার দুর্বার আগ্রহ ফুটে উঠেছিল সেই মুখে। রাতারাতি সেই মানুষ কখনো বদলাতে পারে না। একাজ বাবা কিছুতেই করতে পারেনা। বাবা আমার আর যাই হোক…চোর নয়, চুরি সে করতে পারে না। ওরা মিথ্যে কথা বলছে। মায়ের সঙ্গে বেরিয়ে পড়লাম, পিছু পিছু চলল কৌতূহলী জনতা।

আজ সকালের সোনালী আলো আমার চোখে কালো হয়ে ওঠে। চারিদিকের সবুজ সীমানা, রাঙামাটির বুকে গন্ধকপাথরের হলদে ছোপ, বনঝাউএর বুকে সোঁ সোঁ একটানা বাতাসের ছন্দ—সবকিছু মনে হয় দুঃখ-বিষাদে ভরা। পা দুটো চলতে চায় না, সারা মনে আমার ঝড় বয়ে চলে, সমস্ত শক্তি একত্রিত করে উঁচু টিলাটার উপরে ছুটে যাই, ম্যানেজারের বাংলোর দিকে।

ছবির মত বাংলোটা। দু' পাশে ফুলের গাছগুলো রং বেরং-এর ফুলের ভারে বাতাসে নড়ছে! দুটো ইউক্যালিপটাস গাছ একচ্ছত্র সম্রাটের মত মাথা সোজা করে আকাশের দিকে চেয়ে আছে। দূর থেকে দেখতাম—রূপকথার মায়াবী রাক্ষসীর মত মনে হত ও দুটোকে। আজ সে সব ভাববার মত মনের অবস্থা আর নেই। বারান্দাতেই বসে রয়েছে একটা লোক দুই হাটুর মধ্যে মাথা গুজে, ওপাশে বিজয় দর্পে দাঁড়িয়ে রয়েছে ম্যানেজার, কয়েকজন সেপাই। এদিকে ওদিকে কৌতূহলী চোখে দাঁড়িয়ে রয়েছে আমাদেরই মত কতকগুলো ছেলে মেয়ে—আর্ত্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠি—"বাবা—বাবা!"

হাটুর মধ্য থেকে মাথা তুলল বাবা। দু' চোখে অশ্রুরেখা, জামাটা ছিঁড়ে গেছে—পিঠে কালো কালো দাগ, চুলগুলো উস্কো খুস্কো হয়ে রয়েছে। কাছে এগিয়ে যাই।

ম্যানেজার বাবুর ধমকে মুখ তুলে চাইলাম, "হট—হট এখান থেকে।"

মাটিতে পা শক্ত করে দাঁড়ালাম। সারা দেহে এক দুর্বার শক্তির সঞ্চার হয়।—সরব না—এক পাও সরব না। সব মিথ্যে কথা, বাবা চুরি করেনি! ওরা সব পারে—নিজেদের সামান্য কোন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য বাবাকে কেন, সারা পৃথিবীকেও বদনাম দিতে কসুর করবে না ওরা।

ভুলই বুঝতাম বাবাকে—যদি না কাল রাত্রের সেই পরিবর্তিত মানুষটিকে দেখতাম। দেখলাম বাবা আমাকে দেখে যেন লজ্জাই পেয়েছে। বাবা ত জানে না—আমি দেখেছি ওর মধ্যে আগেকার সেই মানুষটিকে—তাই হয়ত বাবার এই লজ্জা।

পেছনে কতকগুলো বুটের শব্দে ফিরে চাইলাম, পুলিশ এসেছে। মা এতক্ষণ স্থির হয়ে দাঁড়িয়েছিল, হঠাৎ দেখি ব্যাকুল ভাবে ছুটে

গিয়ে ম্যানেজারের পায়ের কাছে বসে পড়েছে—"ও কিছু করেনি, ওকে ছেড়ে দিন। ছেলের হাত ধরে এ মাটি ছেড়ে আমরা চিরদিনের জন্য চলে যাবো। ওকে ছেড়ে দিন ম্যানেজার বাবু!"

মা কেঁদে ফেলে, কিন্তু কেন ওই পাথরের মত নিষ্ঠুর মানুষটার কাছে—ওই মিথ্যাবাদী শয়তানের কাছে মা কাঁদবে? বাবা চুরি করেনি—ওদের কাছে দয়ার দান স্বীকার করা মানেই বাবাকে চোর প্রতিপন্ন করা। এ আমি সইব না! মাকে টেনে তুললাম। ম্যানেজার নির্বিকার।

"উঠে এস মা! বাবা চুরি করেনি; ওরা মিথ্যে বদনাম দেবে—দিক। ওদের দয়া চাই না, ওঠো তুমি!"

হতাশায় ভেঙ্গে পড়ে মা। দুচোখ অশ্রুতে ভরে ওঠে; কাঁপছে সমস্ত শরীর।

বাবাকে ওরা নিয়ে চলল। বাবার চোখেও অশ্রু। যাবার সময় আবেগভরে আমাকে জড়িয়ে ধরে বাবা—

"তোর মাকে দেখিস মনু! তুই শোন,—চুরি আমি করিনি—তোর বাবা চোর নয়।"

বাবার দু' চোখে সেই জ্বালাময় দৃষ্টি। আমি বিশ্বাস করি বাবা চোর নয়।

মাকে নিয়ে বাড়ী ফিরছি, দূর থেকে দেখি আশে পাশে ছেলে মেয়ে লোকজনের জটলা। বাড়ীর মাঠটার চারদিকে ছত্রাকারে ছড়ান আমাদের জিনিষপত্র—আমার বই খাতা, দিদির আগেকার জিনিষগুলো—কয়েকজন দ্বারোয়ান আর হাজিরীবাবু! আজ আমাদের ঘর ছেড়ে দিতে হবে, কোম্পানীর হুকুম। হাজিরীবাবু তালা লাগিয়ে দেন ঘরে।

কথা বলতে পারি না, আজ আমাদের সব নিঃশেষ হয়ে গেল!

বাবা কবে ফিরবে জানি না, মাথার ওপর যেটুকু আশ্রয় ছিল তাও চলে গেল।

দেখি লালু কয়েক জনকে নিয়ে জিনিষপত্রগুলো কুড়োচ্ছে, এগিয়ে আসে আমাদের দেখে।

"শালারা পিশাচ রে।"

কথা কই না--মুখ তুলে চাইলাম তার দিকে। বলে ওঠে সে—"ঠিক আছে, তোদের থাকতে ত আর কুঠী বাংলা লাগবে না, চল আমাদের ধাওড়াতে। এ্যাই ভোদা লে উসব মাথায়, —তোলবে শালা।"

কত স্মৃতিভরা আমাদের এই ঘর! দিদি জয়ন্তদা বাবা, আমাদের কত সুখের দিন। সব নিঃশেষ হয়ে গেল। তবু চোখে জল আসে না, শক্ত হয়ে উঠি। বাবার কথা মনে পড়ে—তোর মাকে দেখিস মনু।

হ্যাঁ—আমি দেখব। সব বোঝা বইবার মত ক্ষমতা আমার আছে। নোতুন আশ্রয়ের দিকে পা বাড়ালাম। পিছনে পড়ে রইল আমাদের অতীত জীবন। সকালের আলোয় ভরে উঠেছে চারদিক। আজ হাটবার—চারদিকে বাঁশীর সুর, মালকাটাদের গানের কলি, হাসির ঝরণা। কিন্তু আমাদের জীবনে যেন সব কিছু আজ হারিয়ে গেল,—সব কিছু থেকে ওরা বঞ্চিত করল আমাকে। লুটে নিল আমার স্বপ্নভরা জগতের আলো—ভালবাসা প্রীতির স্পর্শ, কঠিন পথের পাথরে ছিটকে ফেলে দিল আমাকে। মাকে সঙ্গে নিয়ে পা বাড়ালাম।

কে জানে বাবা এতক্ষণ কত দূরে! কবে ফিরে আসবে তাও জানি না! আজ যাকে বার বার মনে পড়ে সে জয়ন্তদা।

সে থাকলে আজ আমাদের দুঃখ বোধ হয়ত দুর হতো, কিন্তু কোথায় সে জানি না। দিদির উপরও রাগ হয়—সেই আমাদের জীবনের সুর ছন্দ সব সম্পদ নিঃশেষে ছিনিয়ে নিয়ে গেল।

—মা—

নুইয়ে পড়া একখানা টালির ঘর, উঠোন বলতে কিছুই নেই, চারিপাশে ঘিঞ্জি নোংরা এক বস্তিতে এসে উঠলাম! আজ যেন জীবনের সব চেয়ে স্মরণীয় দিন। মেয়ে কোথায় জানি না, স্বামী চুরির অপরাধে জেলের দিকে পা বাড়িয়েছে। আমাদের সাজান সংসারের সব চিহ্ন বিলুপ্ত হয়ে গেল—পড়ে রইলাম আমরা দুজন, মন্টু আর আমি। জীবনে আর কি অভিজ্ঞতা—দুঃখের কাহিনী বাকী আছে কে জানে!

কথা আমার বন্ধ হয়ে আসে। সেদিন আয়নার সামনে নিজেকে দেখে চিনতেই পারি না। সিঁথিতে লাল সিঁদুরের দাগ, হাসিমাখা মুখ...লালপাড় শাড়ী পরা একটি গাঁয়ের বউকে মনে পড়ে। সেই জীবন আমার কোথায় হারিয়ে গেছে—আজ কলিয়ারীর মালকাটা কামিন আর ছেলে টব ঠেলার দলে। স্বামীকে চোর বানিয়েছে, আমার ফুলের মত নিষ্পাপ সুন্দর মেয়েকে এরা ঘরছাড়া—ছন্নছাড়া করেছে। আমার যারা সব কিছু কেড়ে নিল—পথের ভিখিরি করে দিল—মাথায় তুলে দিল কলঙ্কের পসরা তাদের ক্ষমা করব কি করে? কিন্তু উপায় নেই... আমার মন্টুর খাবারের জন্যই ওদেরই নরককুণ্ডে রোজই যেতে হয়। দিনান্ত পরিশ্রম করে—গায়ের রক্ত দিয়ে ওদের টাকার বোঝা বাড়িয়ে তুলে আমরা পাই একবেলার খোরাক।

"সময়টা কাটাবার জন্যই আমাকে নানা কাজে ব্যস্ত থাকতে হয়। ছেলেরাও যেন আমাকে ঘিরে ফিরে পেয়েছে কোন হারানো দিন। মা বাবার স্বাদ ওরা ভুলে গেছে, আমিই ওদের মা হয়ে উঠেছি। ছেলেদের সর্দার লালু বলেছে—মাকে কাজ করতে যেতে 'হবে না, আমরা যা রোজগার করব সবাই তুলে দেব মায়ের হাতে। ঘর-সংসার দেখতে হবে ত?

...হাসিও আসে এত দুঃখে, ঘর-সংসার! ছুপড়ির চালাতেই ওরা ওদের নিজস্ব সংসার গড়ে তুলল আমাকে ঘিরে। ওদের নিয়েই আমি মরুভূমির বুকে ঘর পাতলাম। আমার সব হারাণো মন ওদের সব হারাণোর দলে এসে সান্ত্বনা খুঁজে নিলো!

ভোর বেলাতেই যে যেখানে পড়ে থাকে এ ওকে ঠেলে তোলে, মুখে চোখে জল দিয়ে কতকগুলো রুটি নিয়ে সকলেই চলে যায় হুল্লোড় করে, আবার ফেরে সেই সন্ধ্যায়—দূর থেকে ওদের আসার শব্দ শুনতে পাই। নীরব কুলী ধেওড়ার পথটা চীৎকারে কলরবে মুখর করে কালি মেখে ফিরে আসে। যে যার রোজগার তুলে দেয় আমার হাতে।

খাবার সময় চীৎকার ওঠে সব চেয়ে বেশী, কে কার খাবার ঝাপটা মেরে তুলে নেয়—কেউ বা আর একজনের জলের গ্লাসটা তুলে নেয়, দলের সবচেয়ে ছোট ছেলেটা—কোন কথা বলে না, চোখ দুটোতে কি যেন একটা ব্যথা,--ওকে নিয়েই জ্বালাতন করে বেশী, সেদিন দেখি ওর মাথায় জলের গ্লাসটা উবুড় করে দিয়েছে। আমাকে ঢুকতে দেখেই আবার সব নীরব হয়ে যায়। যেন কত লক্ষ্মী ছেলে।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে মোমবাতির আলোয় আমাকে ঘিরে বসেছে সবাই—গল্প শোনাতে হবে। ছোট ছেলেটার গায়ে কয়লার কালি আর ঘামে জড়িয়ে একটা গন্ধ উঠছিল, সে কিন্তু আমার কাছেই বসতে চায়। বলে উঠি—

"তোর গায়ের গন্ধ যে বড় বিশ্রী !"

লালু এসে থপ্ করে তাকে ধরে তুলে নিয়ে দূরে বসিয়ে দিয়ে নিজেই থপ করে বসে পড়ে সেখানে। সাগ্রহে গল্পে মন দেয় তারপর—

গল্প বলে চলি, হঠাৎ শব্দ শুনি—কে যেন জল নিয়ে হড় হড় করে চান করছে। এই ঠাণ্ডা রাত্রিতে চান করা—ছুটে গিয়ে দেখি সেই ছোট ছেলেটাই! বিস্মিত হয়ে যাই—আমার সামান্য কথায় ওর মনে এতবড় আঘাত লাগতে পারে কল্পনাই করিনি। ধরে নিয়ে এসে তার গা মাথা ভালো করে মুছিয়ে দিতে হাসতে থাকে সকলে। ছেলেটা চুপ করে দাঁড়িয়ে শীতে ঠকঠক করে কাঁপতে থাকে। পুরোনো একটা বড় কোট ছিল ওদের, সেইটে জড়িয়ে দিয়ে বসালাম।

অসময়ে মন্টুকে ফিরতে দেখে বিস্মিত হলাম সেদিন, হাতে তার একখানা কাগজ। হাঁ, মন্টুই! আমাকে দেখেই কাগজটা লুকোতে চেষ্টা করল। এগিয়ে গেলাম—"কি রে ?"

কিছুতেই বলতে চায় না, কেঁদে ফেলল সে। আমি ব্যাকুল হয়ে উঠলাম—"কি হয়েছে, কি হয়েছে মন্টু ?"

"বাবার জেল হয়েছে চার মাস।"—সামনে বজ্রাঘাত হলেও এত বিস্মিত হতাম না।

চারমাস জেল, মন্টু কাঁদছে—চুরি করেনি বাবা—কক্‌খনো চুরি করেনি। মিছে মিছে ওরা বাবাকে জেলে দিল।

আমি কাঁদিনি, এককোটা জলও বার হয় নি আমার চোখ দিয়ে—মন্টুকে সান্ত্বনা দেবার চেষ্টা করি।

"চারমাস, কোন দিকে কেটে যাবে।"

এখানে আর থাকব না মা, ভালো মানুষকে এরা চোর করে

তোলে, কুকুর বেড়ালের মত লাথি মারে মানুষকে। এখানে থাকব না —থাকতে চাই না।

তোর বাবা ফিরে না আসা পর্য্যন্ত থাকতেই হবে মনু। না হলে আমাদে খুঁজবে কোনখানে ?

চুপ করল সে ! তার চোখে মুখে একটা বিতৃষ্ণার ছায়া। এখানের মাটিতে একদণ্ডও থাকতে চায় না সে। এই চার মাস ওকেও বন্দী থাকতে হবে এইখানেই।

সেই সন্ধ্যাবেলাতে খবরটা সবাই শোনে ছেলেরা। ওদের কোলাহল তখনই থেমে যায়। রান্না হয়নি তখনও, নিজেরাই লেগে যায়, রান্না করতে। চুপ করে বসে রয়েছি, সারা বাড়ীতে দুঃসংবাদের ছায়া পড়েছে। ছোট ছেলেটার পানে ফিরে চাইলাম।

আমাদের দুঃখে সেও সহানুভুতি জানাতে চাইলো—"বড় হয়ে আমিও জেলে যাব।" প্রশ্ন করলাম—"সে কি ? জেল ত চোর আর বদমায়েসদের জন্য। তুমি কেন জেলে যাবে ?"

"বারে, তবে মনুর বাবাকে কেন ধরে নিয়ে গেল ওরা ?" ছোট ছেলের মনেও আজ লেগেছে এই চিন্তা।

আর গল্পের আসর জমে না আজ। লালু সকলকে সাবধান করে দেয়, বিশেষ করে ছোট ছেলেটাকে—"খবরদার আজ মাকে বিরক্ত করবি না।" খেয়ে দেয়েই শুয়ে পড়ে সবাই। ফুঁ দিয়ে আলো নিভিয়ে দেয়।

চার মাস যেন আর কিছুতেই কাটতে চায় না। কত দিনে মাস হয় কে জানে, মাস আর শেষ হয় না। রান্নাঘরের দেওয়ালে খড়ির দাগ দিয়ে দিয়ে দিনের হিসাব রাখি, আর ভাবি যখন সমস্ত দেওয়ালটাই এই রকম দাগে দাগে ভরতি হয়ে যাবে তখন হয়ত শেষ হবে এই চার মাস।

মন্থু জিজ্ঞাসা করেছিল সেদিন—"কিসের দাগ ওগুলো ?" মন্থুকে মিথ্যে বলেছিলাম—"চালের হিসাব লিখতে জানি না তাই দাগ কেটে রাখছি।"

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে মন্থু কাজ থেকে ফিরে এসেই হাত পা না ধুয়ে আমার কাছে হাজির হল। ছেলেদের খাবার জায়গা করছি—কলাই করা বাসনগুলো মেজে চলেছি, মন্থুকে হাসতে দেখে মুখ তুলে চাইলাম। পকেট থেকে কি একটা বার করছে মন্থু। বলল—"বাবার চিঠি।"

ছুটে এলাম সাগ্রহে। জেলের ছাপ নিয়ে কত কি কালির দাগ বুকে নিয়ে হাজির হয়েছে ওই কাগজটুকু, কত আসা আনন্দের বাণী নিয়ে। ভিজে হাতেই চিঠির স্পর্শটুকু নিলাম। আর যেন তর সয় না আমার। পড়তে জানি না, কি যেন কালির আঁকা বাকা দাগ। আমার অত ব্যাকুলতা দেখে মন্থু হাসছে। জিজ্ঞাসা করি—"কি লিখেছে ? ভাল আছে ত ?"

মন্থু ঘাড় নাড়ে—"হ্যা ভালো আছে, আসতে আর দেরী নেই। লিখেছে—মন্থু কি করছে, তুমি আর কাজ করছ কি না, কি করে দিন কাটাচ্ছ ?"—এই সব।

তাহলে আমার কথা মনে আছে, মন্থুকে ভোলেনি, আমাদের জন্য দূরে গিয়েও ভাবনা হয় ?—হবে না কেন ? চিরদিন সমস্ত বোঝাই বয়ে এসেছে আমাদের, আজও তার দায়িত্ব ভুলতে পারে না।

রাত্রিবেলাতে খাওয়া দাওয়ার পর ছেলেদের মধ্যে পড়ে শোনায় মন্থু চিঠিখানা, তারাও শুনবে। মন্থু এক কোনে বসে পড়ছিল, লালু সকলকে থামিয়ে দিয়ে কথাবার্তা না বলে মন্থুকে নিয়ে গিয়ে তুলে দেয় একটা ভাঙ্গা টেবিলের ওপর। হুকুম করে—

"নে পড় জোরে জোরে!"

একটা জায়গা মন্থু পড়ে না; সেখানটার কথা আমাকে বলে চুপে চুপে রাত্রিতে। চারিদিক নীরব নির্জন। মন্থু আমাকে আদর করে গলা জড়িয়ে ধরে। আজ বাবার স্মৃতি তার মনকেও ব্যাকুল করে তোলে।—"বাবা কি লিখেছে জানো মা, লিখেছে ফিরে গিয়ে মন্থুকে আবার পড়াশোনা করতে দেব। আমরা এখান থেকে চলে যাব অন্য কোথাও।"

কথা কই না, মন্থুর দিকে চেয়ে থাকি। সারা মনে বড় হবার একটা দুর্বার আগ্রহ ওর। ওর শিশু মনে আজ মানুষ হবার সাধ!

—"এমনি করে জানোয়ারের মত খেটে কেউ বাঁচতে পারে মা—মানুষ হওয়া ত দূরের কথা। বাবা ফিরে এলে আমি যেমন করে হোক আবার পড়ব, পাশ করতেই হবে আমাকে।"

মন্থুকে কাছে জড়িয়ে ধরি। আমার ছেলে আমার একান্ত নির্ভরের স্থান—তাকে আমার সমস্ত চেষ্টা দিয়ে মানুষ করে তুলবই।

…কয়েকটা দিন গেলেই আমার সমস্ত দুঃখের অবসান ঘটবে। আবার আমার ঘরে ফিরে আসবে শান্তির দিন! সারাদিনের কর্ম ক্লান্তির পর ঘরে আসবে আমার স্বামী—তার হাত পা ধোবার ব্যবস্থা করে খাবার ধরে দোব সামনে—মন্থু ফিরে আসবে স্কুল থেকে!

হারিকেনের আলোয় পড়ছে মন্থু। মন্থুর বাবা আসনপিড়ি হয়ে বসে গল্প করছে আমার সঙ্গে। উনুনে আঁচ দিয়ে কুটনো কুটতে বসেছি…ওর হাসির শব্দে ঘরখানা ভরে ওঠে! বাধা দিই—"আঃ, কি হচ্ছে, মন্থু পড়ছে ও ঘরে!"

…হঠাৎ কাদের কোলাহলে আমার স্বপ্ন ভেঙে যায়—কোথায় বা সেই সন্ধাবেলার হাসিমাখা গৃহকোণ। আবার সেই নোংরা বস্তি—সেই জঞ্জালের স্তূপ! সচকিত হয়ে এগিয়ে গেলাম। ছেলেরা নীরবে ঢুকছে কাকে ধরে নিয়ে। রক্তাক্ত অচেতন দেহটা দেখে আর্তনাদ

করে উঠি ; অস্ফুট একটা আর্ত্তনাদ ! সারা গা হাত পা ছিঁড়ে গেছে, কয়লার কালো রংএর সঙ্গে জমাট বেঁধে গেছে চাঁই চাঁই রক্তের ছাপ। কপালটা কেটে গেছে—মুখ চোখ ফুলে উঠেছে।

মন্টু—আমার মন্টু !

মন্টুকে হাওয়াতে শুইয়ে দিয়ে গরম জল করতে যায় লালু। ঠাণ্ডা জল দিয়ে ওরা ধোয়াচ্ছে ওর গা মাথা। মন্টুর কোন সাড়া শব্দ নেই। সারা পৃথিবী যেন পাক খায় আমার চোখের সামনে ; অসীম শূন্যতা—একটা তারার স্তিমিত জ্যোতি ! তারপর যেন সব অন্ধকার !

সব যেন গোলমাল হয়ে যাচ্ছে আমার। একি স্বপ্ন না—সত্যি, ঠাওর করতে পারি না। ওদের কোলাহলে জ্ঞান ফিরে আসে। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছি···মন্টুর অচেতন দেহটার দিকে !

···মন্টু—বাঁধভাঙ্গা আবেগে আমি লুটিয়ে পড়লাম ! আমার একমাত্র সন্তান—শত দুঃখের মাঝেও এই একটুকু সান্ত্বনা—তাও কি বিলুপ্ত হয়ে যাবে ওই নরপিশাচদের অত্যাচারে ? সমস্ত শরীরের চেতনা ফিরে আসতে মাথায় একটা তীব্র উত্তাপ অনুভব করি। শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় চঞ্চল রক্তস্রোত।—বিনা প্রতিবাদে ওরা আমার সব কেড়ে নেবে কেন ?

কি দোষ করেছিল আমার মেয়ে—তার জীবন ওরা বিষিয়ে দিল। কি দোষ করেছিলো আমার স্বামী—অনাহারে অপমানে জর্জরিত করে ওরা তাকে চোরের পর্য্যায়ে এনে ফেলছে ? কি দোষ করেছিল আমার দুধের ছেলে—যে তার জীবনের সমস্ত আশা আনন্দ নিঃশেষ করে দেবে ওরা ? আর আমি কি অপরাধ করেছি ওদের কাছে যে নীরবে একটার পর একটা আঘাত বিনা প্রতিবাদে সহ্য করব—মাথা পেতে নেব—কেন ?

···কোথায় চলেছি জানিনা—সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে চড়াই

ভেঙে ছুটে চলেছি! জবাব চাই আজ এর। আজ আর কোন বাধা, কোন লজ্জা, কোন অপমানই আমাকে আটকাতে পারবে না। আমি ত নীরবে চিরদিনের জন্যই ছেড়ে যেতাম ওদের রাজত্ব। কোনদিন আর ছায়া মারাতাম না এদের। কিন্তু আজ কি সর্বনাশ এরা করেছে আমার জানে না। ক্ষিপ্র পদে এগিয়ে চলি অসহ্য জ্বালায়। ওদের মুখোমুখী হয়ে আজ বোঝাপড়া আমি করবই!

কলিয়ারী অফিসের গেট দিয়ে প্রবেশ করি। ওই থামের পাশে আমার স্বামীকে আটকে রেখেছিল ওরা। দারোয়ান বাধা দিতে আসে—এক ঝটকায় তার হাতটা সরিয়ে দিয়ে ঢুকে পড়লাম অফিসের মধ্যে—একেবারে সামনের ঘরে।

আমার দিকে মুখ তুলে চেয়ে বিস্মিত হয়ে যায় ম্যানেজার! হয়ত আমাকে দেখে! কাপড়চোপড় আমার ছেঁড়া—ময়লা, রুক্ষ চুল তেলের অভাবে জট পাকিয়ে গেছে, চোখের তারায় একটা বহ্নি জ্বালা। —আজ জবাব চাই।

"কলিয়ারীর অ্যাকসিডেণ্টে এমন হয়ই!"

অ্যাকসিডেণ্ট! দুর্ঘটনা! আমার ফুলের মত মেয়ের তুমি—তুমি সর্বনাশ কারেছো, তাও কি অ্যাকসিডেণ্ট? আমার স্বামী—তাকে মাতাল করে তুলেছ—চোর বদনাম দিয়ে জেলে পাঠিয়েছো, তাও কি অ্যাকসিডেণ্ট? জবাব দাও—চুপ করে রইলে কেন?

"তোমার ছেলে জখম হয়েছে শুনেছি—কিন্তু এতে আমার কোন হাত নেই; কিছু টাকা নিয়ে যাও!" কয়েকটা টাকা বার করে এগিয়ে দেয় আমার দিকে। সমস্ত শরীর জ্বলে ওঠে—আমার এতে কিছু হাত নেই; যেখানে তোমার নিজের হাত ছিল সেখানেও চরম সর্বনাশ করেছো তুমি আমার। এতে তোমার কোন হাত ছিল না তাই আমার ছেলে এখনও বেঁচে আছে। টাকা—অনেক

টাকা তোমাদের, নয় ? আর আমাদেরই রক্ত শুষে অনেক অনেক সঞ্চয় করেছো। আমরাই তা ছিনিয়ে নোব জোর করে—তোমাদের কাছে হাত পেতে ভিক্ষে নিয়ে নয় !

টাকাগুলো ওর বিকট মুখের ওপর ছুড়ে দিয়ে বার হয়ে এলাম। সশব্দে সে গুলো ছিটিয়ে পড়ল ঘরের মেজেতে। দ্বারোয়ানটা আর কয়েকজন বাবু বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার মুখের দিকে চেয়ে রইল। মাথা উঁচু করে বার হয়ে এলাম আমি।

কিন্তু মনে হল আমারই হার হয়েছে। যে অগ্নিজ্বালা বুকে নিয়ে এতদূর এসেছিলাম, আমার এতদিনের সঞ্চিত সেই বিক্ষোভ—সেই প্রতিবাদ—কি এমনি করেই শেষ হয়ে যাবে। এসেছিলাম প্রতিশোধ নিতে—আমার ছেলের রক্তের বদলে আমার মেয়ের সম্মানের বদলে—ওর বুকের রক্ত নিয়ে যেতে। কিন্তু কই তাত আমি পারলাম না !—কেন ?

হয়ত আমার বয়সের জন্যই রক্তে এসেছে এই শান্তিপ্রবাহ, তাই নিজের যেটুকু এখনও আছে তা আর হারাতে চাইনা—আপোষ রফা করে ওদের দয়া কুড়িয়ে আবার বাঁচতে চাই—তাই হয়ত চরম আঘাত হানতে পারিনি ওদের বুকে।

মন্টু...এতক্ষণ মন্টুর কথা মনেই ছিলনা, অজ্ঞান অবস্থায় রেখে এসেছি তাকে, চিকিৎসারই বা কি হবে তার—?

আবার যেন মাটির পৃথিবীতে ফিরে এলাম, কোন আশা নেই—ভরসা নেই। স্বামী আজ বহু দূরে। অন্ধকার কারাগারে বসে কলঙ্কের মসীলিপ্ত অদৃষ্টে কারাবাসের শেষ দিন গুণছে। আমার ফুলের মত সুন্দর মেয়ে জীবনের পথ থেকে কঠিনতম আঘাত খেয়ে অন্ধকারে ছিটকে পড়ে কে জানে কোথায়। আশে পাশে এমন কেউ নেই যে এসে দাঁড়াবে আমার চরমতম বিপদে—দুঃখের দিনের সাহস আর

নির্ভর। বিরাট বিশ্বে আমি একা, প্রতিবাদ করবার শক্তি আমার কোথায় ?

যেমন করে হোক মন্টুকে বাঁচাতেই হবে। ছুটলাম কলিয়ারী হাসপাতালের দিকে। অন্ধকার নেমে এসেছে চারিদিকে, উঁচু নীচু পথ দিয়ে বনতুলসীর জঙ্গল ভেদ করে চললাম সামনে—আলোকিত হাসপাতালটার দিকে।

লাল সুরকি ঢালা পথটার দুপাশে সুন্দর মাপ মত ছাটা গাছের বেড়া। গাছে গাছে ইলেকট্রিকের আলো। ওপাশে ডাক্তার বাবুর বাসায় বাজছে রেডিওতে বিদেশী একটা সুর। টুকরো হাসির শব্দ ভেসে আসে মাঝে মাঝে।

সামনের লনে কয়েকটা চেয়ার পেতে বসে ডাক্তার বাবু আর কয়েকজন মেয়ে তাস খেলছে। চারিদিকের আবহাওয়াতে আমার মত ছিন্ন মলিন পোষাকের কোন ঠাঁই নেই। মূর্ত্তিমান অভিশাপের মত সেখানে গিয়ে দাঁড়াতে সকলেই আমার মুখের দিকে চাইলো। একটা বেয়ারা এগিয়ে এল।

আমারই মত ওর ঘরেও হয়ত ছেলে বৌ অনাহারে ভুগছে, তবু আমাকেই তাড়াবার জন্য উদগ্রীব হয়ে এসে দাঁড়ালো—প্রভুর হুকুম পেলেই হয় আর কি।

"ডাক্তার বাবু! আমার ছেলে আজ কলিয়ারীতে"—

ডাক্তার বাবু কিছু বলবার আগেই ওপাশ থেকে একজন খেঁকিয়ে উঠল—"হাসপাতালে নিয়ে এস, এখানে নয়।"

"হাসপাতালে আনতে পারলে তাকে নিয়েই আসতাম।"

তবে আর কেন এসেছিস ? যা কাঠকুটোর যোগাড় করগে। যতসব—"

সারা দেহে আমার শিহরণ খেলে যায়। এতবড় অমঙ্গলের কথা

শুনব, এ স্বপ্নেও ভাবিনি। আমার অজ্ঞাতেই আমার কণ্ঠ থেকে বার হয়ে আসে একটা অস্ফুট আর্তনাদ।

"—না—না!"

হঠাৎ কোন দিকে কি হয় গেল বুঝতে পারি না, ডাক্তার বাবুর পায়ের কাছে বসে পড়ে দুর্বার শক্তিতে একমাত্র নির্ভর স্থল ভেবেই তার পা দুটো জড়িয়ে ধরে কাঁদতে থাকি। এতক্ষণের রুদ্ধ অশ্রু প্রকাশ পথ পেয়ে আঝোরে বার হয়ে আসে।

চারিদিকে একটা কোলাহল ওঠে, কে যেন টেনে আমাকে সরিয়ে নেয়, ডাক্তার বাবুর জুতো শুদ্ধ পায়ের আঘাতে আমার চোখ দুটো রক্তাক্ত হয়ে গেছে। কেমন একটা নোনতা স্বাদ, থুথুর সঙ্গে খানিকটা রক্ত বার হয়ে আসে। টেনে হিঁচড়ে ওরা আমাকে মাঠের বাইরে বের করে দেয়।

—"পাগলামী করবার জায়গা পাসনি বজ্জাত কোথাকার?"

উঠে দাঁড়ালাম। ওদের হাতের ধাক্কায় ছিটকে পড়েছিলাম পাথরের ওপর, হাত আর হাটুটা ছড়ে গেছে। কানের মধ্যে ওদের কথাটা তখনও গরম শিসের মত জ্বালা করছে।

"পাগলামী।"

ছেলের চিকিৎসার জন্য ব্যাকুল হয়ে মায়ের ছুটে বেড়ান পাগলামী ছাড়া আর কি? আর আমি এখনও পাগল হইনি কেন?

কি ছিলাম—কোথায় এসে দাঁড়িয়েছি, এ ভাবতেই পারি না। আমার মেয়েকে ওরা ঘরের বার করেছে—তার জীবন ব্যর্থ করে দিয়েছে, আমার দেবতার মত স্বামীকে পরিণত করেছে একটা নরপশুতে; আমার একমাত্র ছেলে তার জীবন নিয়ে ওরা ছিনিমিনি খেলছে, আমার জীবন, সাজান সংসার, ঘরকন্না ওরা তছনছ করে

দিয়েছে। তবুও ওদেরই পায়ে গিয়ে পড়েছি এতটুকু দয়া—এতটুকু করুণার জন্য। পাগলামী ছাড়া আর কিই বা বলব একে ?

চারিদিকে অন্ধকার ঘন হয়ে উঠেছে। উঁচু নীচু পথ বেয়ে খাওড়ার দিকে যাই, কে জানে মনু এখন কেমন আছে। তাকে এই অবস্থায় ফেলে আসা ঠিক হয়নি আমার।

নিজের রাগে—নিজের জ্বালায় বার হয়ে পড়েছিলাম—কিন্তু স্পষ্টই বুঝে গেলাম আমার ক্ষমতা কতটুকু ওদের প্রচণ্ড প্রতাপের কাছে। প্রতিবাদের কি কোনই পথ নেই ? মুখ বুজেই কি এই অকথ্য অত্যাচার সহ্য করতে হবে ? কিন্তু—কতদিন ? আকাশের দিকে চেয়ে আজ বৃথাই ভগবানের সন্ধান করি।

প্রদীপ জেলে সন্ধ্যাবেলাতে প্রণাম করেছি—প্রত্যহ লক্ষ্মীর বন্দনা গেয়েছি—বারমাসের তের পার্বণ, ব্রত উপোস করেছি—আজ অনুভব করি সবই মিথ্যে, বেমালুম ধাপ্পা ওসব। সত্যিই যদি ভগবান থাকে তবে আমি নিরপরাধ নির্দোষ—আমার উপর কেন এই আঘাত—কেন এই অত্যাচার ?

আকাশের সীমানায় সীমানায় আবার দৃষ্টিকে প্রসারিত করলাম—কিন্তু কোন ভগবানেরই সাক্ষাৎ পেলাম না সেদিন !

—মিনতি—

বিচিত্র এখানকার জগৎ, এক কলিয়ারীর পাশে আবার আর এক কলিয়ারী। লোক এখানে বাস করে অতি মুষ্টিমেয়। মানুষ বলতে যা বুঝি সে রকম জীব এখানে অতি অল্পই। অগুণতি সীমা সংখ্যাহীন যারা রয়েছে—মানুষের পর্য্যায়ে তাদের ফেলে না কেউ। তারা মালকাটা—তারা শ্রমিক। আমরাও তাদেরই শ্রেণীতে নেমে এসেছি আজ—মিশে গেছি সেই অপরিচয়ের অন্ধকারে। বিলীন হয়ে গেছে আমাদের অস্তিত্ব। কেউ চেনে না—জানে না, খোঁজ খবরও রাখে না।

এরই জন্য বেশী দূর না গিয়েও আমরা বেমালুম হারিয়ে গেলাম জনতার মাঝে। এ জনতার কপালে কোন ছাড়পত্র নেই সভ্য সমাজের। অন্ধকারের মাঝেই এদের বাস।

এমনি এক ঠাঁই বাসা বাঁধলাম আমরা—আমি আর জয়ন্ত।

ছোট্ট দুখানা ঘর। ভাঙ্গা টালি আর ঝুরো গরদা দিয়ে কোন রকমে জোড়া দেওয়া। বর্ষাকালে ঘরও নয়, তেতুল তলায় পরিণত হয়। আকাশের বৃষ্টি যদিও বা থামে—তেঁতুল তলার বৃষ্টি থামে না। পাতা চুঁইয়ে ঝরে বহুক্ষণ।

তবুও ভাল লাগাবার চেষ্টা করি। জয়ন্ত হাসে—আমার ঘর-গেরস্থালীর খুঁটিনাটি ব্যাপার দেখে। সকাল বেলাতে বার হয়ে যায়—

ওপাশের একটা স্কুলে কাজ নিয়েছে। তার খাবার যোগাড় করা—ভোরে উঠেই উনুনে আঁচ দিয়ে—ঘরদোর সাফ করে বিছানাতে চা নিয়ে হাজির করতাম। অঘোর ঘুম জয়ন্তের, ওর ঘুম কাতর দেহখানাকে ঠেলে তুলে দিতেই হাই তুলে উঠে বসত, আড়মোড়া ভেঙ্গে চায়ের বাটিটা হাতে নিয়ে হেসে বলত—

"অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর,

অতি বড় সুন্দরী না পায় বর। জানোত—এত ঘরকুণো হয়োনা।"

সব হারিয়েছি আমি বাবা, মা, ভাই! এরপর শেষ আশ্রয়টুকুও আর হারাতে চাই না—তাই চমকে উঠতাম!

আমার অন্তরের এই দীনতায় ও আরও যেন আমাকে আঘাত দেবার জন্য উঠে পড়ে লাগত।

জয়ন্ত চলে যাবার পর আবার সেই একা। সমস্ত চিন্তা মনে ভিড় করে আসে, মাথার মধ্যে পাক দেয় আমার অতীতের দিন গুলো। কত স্বপ্নরঙীন দিন! পৌষ পার্বণের হিমেল রাতের কত গানের সুর, শ্যামল প্রান্তরের সীমানাঘেরা আমাদের ছোট্ট গাঁ—আমাদের বাড়ী, বাবা মা মন্টু।

হাসির শব্দে চমকে উঠি হঠাৎ। বাড়ীর বাইরে একটা মাত্র কল, অল্প অল্প ধারায় জল পড়ে—ভাগীদার তার ধাওড়া শুদ্ধ সবাই—কলসীটা বসিয়ে দিয়ে এসেছিলাম একটু আগে, আনতে গেছি—আমাকে দেখেই সমবেত মেয়েদের একটা চাপা গুঞ্জন। উৎসুক এবং বিস্মিত দৃষ্টির খোঁচা লাগে আমার সর্বাঙ্গে। চাপা ফিস্‌ফিসানি ওঠে।

"ঘর থেকে বার করে নিয়ে এসেছে ওই লোকটা।" কে যেন বলে—"ওর সঙ্গেই আছে না আর কেউ যাওয়া আসা করে?"

অপমানে শরীর উষ্ণ হয়ে ওঠে। কিন্তু ওদের সঙ্গে কথা না বলে ওদের সমস্ত মন্তব্য হজম করে কলসীটা নিয়ে ঘরে ঢুকে দরজাটা

বন্ধ করে দিই। একরাত্রির অপমান আমাকে সারাজীবনের জন্য এত বড় কলঙ্কিনী নাম দেবে এ ভাবতেই পারি না।

সন্ধ্যা নেমে আসে। সে দিন ফিরতে দেরী হবে জয়ন্তর, কোথায় যেন গেছে। আশেপাশে ওদের সঙ্গে মিশতে পারি না। একটা ছোট ছেলে আসত আমার কাছে—মন্থুর মতই দেখতে। একাই ঘরে রয়েছি, আজও বিকেলে এসেছিল ছেলেটা, হঠাৎ বাইরে থেকে কার ডাক শুনে উঠে গেল দরজার বাইরে। চমকে উঠলাম ! ছেলেটাকে ওর মা মারছে, গর্জন শোনা যায় মায়ের—"ফের যদি ওই নষ্টা মাগীর ঘরে যাবি মেরে ফেলবো তোকে !"

শিউরে উঠি। ওদের সমাজে, ওদের চোখে আমি কি এতই নীচ ! দরজাটা বন্ধ করে দিলাম। চোখের ধারা বাঁধ মানল না।

একাই বসে রয়েছি একখানা বই খুলে। বাইরের দরজায় শব্দ হল—জয়ন্ত এসেছে হয় ত ! তাড়াতাড়ি গিয়ে দরজাটা খুলে দিতেই দেখি—সামনে একটা লোক দাঁড়িয়ে হাসছে, বিশ্রী কুৎসিত ওর হাসি। তীব্র ঝাঁজলো একটা গন্ধ ওর মুখে।

ওই হাসি—ওই গন্ধ আমি চিনি। চিনেছি আমার জীবনের যথাসর্বস্বের বিনিময়ে এক বৈশাখীর ঝড়ো সন্ধ্যাবেলায়। ওই হাসির ধারালো ছুরি আমার জীবনের সব স্নেহমমতার বাঁধন কেটে দিয়েছে ! নিঃশেষ করে দিয়েছে আমার মনের সমস্ত আশার কুসুম দল !

নীরবে সহ্য করেছি সেদিন। চোরের মত রাতের অন্ধকারে পালিয়ে এসেছি নিজেকে বাঁচাবার জন্য। পালালেও পিছুপিছু তাড়া করে ওরা। প্রতিবাদ করতে হবে এর। আমার সমস্ত শক্তি দিয়ে—সত্বা দিয়ে প্রতিবাদ করতে হবে—তাই এগিয়ে গেলাম। কুশ্রী লালসা মাখান দৃষ্টিতে তাকাল লোকটা।

সমস্ত শক্তি একত্রিত করে একটা চড় বসিয়ে দিলাম ওই পশুটার গালে। আমার শরীরে এত শক্তি জানতাম না! অতর্কিতে চড় খেয়ে লোকটা ছিটকে পড়ল ওপাশে। ক্রুদ্ধা ফণীনির মত আমি তখনও খাড়া দাঁড়িয়ে—আমার চোখে প্রতিবাদের আগুন। লোকটা উঠে আস্তে আস্তে অন্ধকারে মিলিয়ে গেল।

অসহ্য উত্তেজনায় কখন যে ঘরে এসে ঢুকেছিলাম জানিনা, টের পেলাম যখন জয়ন্ত এসে বলছে—"একি কাঁদছ কেন?"

জবাব দিই না। এর জবাব দেবার কিছু নেই। আমার অন্তরের ঝড়—এ চরম অপমানের কাহিনী ওকে বোঝাবার ভাষা আমার নেই!

মানুষ ভালবাসতে পারে তখনই যখন তার আশে পাশে থাকে নিশ্চিন্ত নির্ভর। সারা মনে যার বুকযোড়া জ্বালা, সে বিদ্রোহ করে—ভালবাসার পথ সে খুঁজে পায় না।

মনের অতলে আমার এই জ্বালা যেন ছাপিয়ে উঠছিল—প্রকাশ পথ চাইছিল। ভালবেসে নিজেকে সমাধিস্থ করার চেয়ে—নিজেকে ভুলিয়ে এই অপমান থেকে দূরে সরে যাওয়ার চেয়ে, নিজেকে আগুনের ফুলকির মত জ্বালিয়ে দিতে চেয়েছিলাম। কোথায় যেন আমার মনের অতলে এই দুর্বার শক্তি দানা বেঁধে উঠছিল আমার অজ্ঞাতসারে।

আমার এই পরিবর্ত্তন দেখে বিস্মিত হত জয়ন্ত। আগেকার আমি বদলে যাচ্ছি। বাবা মায়ের সংসারে আমি ছিলাম এক টুকরো সবুজ ক্ষেতের মত শ্যামলিমায় ভরপুর—সজীব। একটির পর একটি আঘাতে সে প্রাণ আমার কোন দিকে নিঃশেষ হয়ে গেল!

"কি এত ভাব বলত তুমি?"

"কিছু না।"

"শরীর খারাপ নয় ত?"

"না"

জয়ন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে। "আর গানই গাওনা—গান ভুলে গেলে নাকি ?"

গান! আমার জীবনে বোধ হয় গানের ঠাঁই আর কোন দিনই হবে না। সমস্ত সুন্দর আমার জীবনে ব্যর্থ হয়ে কেঁদে ফিরে গেছে। ভিতরের অসহ জ্বালা সমস্ত সজীবতাকে পুড়িয়ে ছাই করে দিয়েছে।

"বাবা মায়ের জন্য মন কেমন করে মিনু ?"

জয়ন্তর কথায় মুখ তুলে চাইলাম। মন কেমন করে তা বলবার ভাষা নেই, কিন্তু জানি সেখান থেকেও চির নির্বাসিত আমি, ওখানেও মুখ দেখাবার পথ নেই আমার।

তবুও কেন বার বার মন ছুটে যায় জানি না। এতদিনের স্নেহ মায়া দিয়ে ঘেরা সংসার—আমার মা বাবা ভাই ওদের ভুলতে পারি না। কি এক দুর্বার আকর্ষণে একদিন বার হয়ে পড়লাম পথে।

দুপুর বেলা লোকজন বিশেষ নেই, সকলেই কাজে বার হয়ে গেছে। রাস্তার ধারে ছায়া-শীতল অশথগাছের নীচে ভিড় জমিয়েছে বাওড়ার দুচারটে ছেলে, বিড়ি টানছে—না হয় অশ্রাব্য ভাষায় কি সব বলাবলি করছে আমাকে দেখে। কেউ বা পয়সা খেলছে মাটিতে গাব্বু করে। জুয়োখেলায় হাতে খড়ি হচ্ছে সবে।

আমাদের বাড়ীটার কাছে এসে থমকে দাঁড়ালাম। লজ্জায় মাথা নীচু হয়ে আসে। সঙ্কোচ আর ভীরুতা আমার পা দুটোকে বেঁধে ফেলেছে—তবু ও এগিয়ে গেলাম বুক বেঁধে। আমার অপমান কোনখানে ? নিজেকে বাঁচাবার জন্যই এখান থেকে চলে যেতে বাধ্য হয়েছিলাম।

চোখের সামনে ভেসে ওঠে মা-মনু-বাবার মুখগুলো আমাদের শান্তিপূর্ণ সংসার। গিয়ে মাকে জড়িয়ে ধরে আবেগভরে কেঁদেই

বলব, মাকে বলা হয়নি সেরাত্রের কথা, মা শুনলে আমাকে নিশ্চয়ই ক্ষমা করবে। মন্নু হয়ত ছুটে আসবে।

কিন্তু একি! বাড়ীর কাছে এসে দেখি দুপুরের রোদ খাঁ খাঁ করছে। আশে পাশে কেউ নেই। আমাদের বাড়ীর দরজায় তালা বন্ধ।

বুকটা কেমন ছ্যাঁৎ করে ওঠে অজানা আতঙ্কে, কোথায় গেল ওরা। তবে কি বাবা, মা, মন্নু আমারই দেওয়া কলঙ্কের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্য এ মাটি ছেড়ে অন্যত্র চলে গেছে। আমিই কি তাদের তাড়ালাম! নিজের জন্য নয়—আবার কোন অনিশ্চিত পথে তারা ভেসে গেল স্রোতের টানে, তাদের জন্যই আমার চোখে জল আসে।

মায়ের কাছে ক্ষমা কি আমার চাওয়া হবে না? ওরা কি ভুলই বুঝে চলে যাবে আমাকে। চোখের জলে পথ ঝাপসা হয়ে আসে। দরজার বাইরেই বসেছিলাম এতক্ষণ, খেয়াল হতে চোখ মুছে আবার পা বাড়ালাম আমাদের বাসার দিকে।

ধাওড়ার বাইরে রাস্তার ধারে খানিকটা জল জমেছে। কোন কলিয়ারীর তলা থেকে পাম্প দিয়ে তোলা জল অপেক্ষাকৃত ঢালু জায়গা পেয়ে ওখানেই বাসা বেঁধেছে। ধাওড়ার লোকজন স্নান করে ভইস্ বয়েলেরও গা ধোয়ায় ওই জলে। মালকাটারা খাদ থেকে বার হয়ে ক্ষার সাজিমাটি দিয়ে গা ধোয়। ছোট একটা ছেলেকে সেখানে গা ধুতে দেখে থমকে দাঁড়ালাম। কয়লার কালীতে তার সর্বাঙ্গ ভরে রয়েছে, মাথার চুল চোখের ভ্রূ সব কালিতে ঢাকা। আপন মনেই স্নান করে চলেছে সে। মন্নুর মতই দেখতে, কিন্তু মন্নু ত স্কুলে পড়ে। এখানে এ অবস্থায় আসবে কি করে? হয়ত আর কেউ। না-না মন্নুকে এ অবস্থায় কোনদিনই যেন দেখতে না হয়, সে সুখী

হোক, সে বড় হোক। এ মন্দ নয়। তাড়াতাড়ি পা চালিয়ে যাই সেখান থেকে। ছেলেটা আমাকে দেখতে পায়নি, একটা গাছের আড়ালে স্নান করছে আপন মনে।

দিনের আলো নিভে এসেছে। কুয়াসা ঢাকা আকাশের বুকে অগণিত কলিয়ারীর বুক থেকে নির্গত ধোঁয়ার কুণ্ডলী জমাট বেঁধেছে বায়ুস্তরে। দু' একটা করে আলো জ্বলে উঠেছে উপত্যকার কলিয়ারীতে, রেলওয়ে সাইডিং-এ।

স্বল্পালোকিত রাস্তায় একটা লোককে টলতে টলতে আসতে দেখে সরে দাঁড়ালাম। মাতালের সংখ্যা এখানে কম নয়। অস্পষ্ট এক ঝলক আলোতে লোকটার মুখের দিকে চাইতেই চমকে উঠলাম। পায়ের তলা থেকে মাটি যেন সরে যাচ্ছে, সমস্ত ইন্দ্রিয়গুলো কেমন যেন অবশ হয়ে আসে। ওর চেহারায় এসেছে একটা আমূল পরিবর্তন। এ যেন আমার স্বপ্নেরও অতীত। এই দৃশ্য দেখার চেয়ে মরাই ছিল আমার কাছে সম্মানের। বাবা— আমারই বাবার এই অবস্থা। কপালের কাছে একটা ক্ষতের দগদগে ঘা, মাথার চুল জট পাকিয়ে গেছে। পরনের কাপড়খানার নীচের দিকটা ফালি হয়ে মাটিতে লুটোচ্ছে প্রতি পদক্ষেপে, জামার এক দিকটা ছিঁড়ে বার হয়ে গেছে অর্দ্ধেকখানা। চোখের দৃষ্টিতে এসেছে ঘোলাটে ভাব। অ্যাৎকে উঠি—"বাবা!"

লোকটা থমকে দাঁড়ালো, হয়ত লুপ্তপ্রায় স্মৃতির অতল থেকে খুঁজছে আগেকার দিনগুলোকে তখন কে যেন এমনি ডাকে ডাকত তাকে। পরক্ষণেই হেসে ওঠে—

"বাওয়া বাওয়া ত সবাই, তুমি কে বাওয়া, ঘোমটার ভেতর খ্যামটা নাচতে এসেছ?"

পাথরে নিজের মাথা ঠুকে রক্তগঙ্গা করতে ইচ্ছে করে। আর কথা

না বলে চলে গেল—দেখলাম বার কয়েক রাস্তায় পড়ে গিয়ে কোন রকমে উঠে টলতে টলতে মিলিয়ে গেল অন্ধকারে। আমি বজ্রাহতের মত দাঁড়িয়ে রয়েছি। এ দৃশ্য আমার জীবনে প্রথম—এ সম্বন্ধে অনুভূতির কোন অভিজ্ঞতা আজ ও আমার মনে নাই।

বুঝলাম এতদিনের শক্ত ভিতের উপর গড়া আমাদের সংসার আজ এই—স্নেহপ্রীতি দিয়ে রচিত আমাদের স্বর্গ, এক প্রচণ্ড ধাক্কায় ছিটকে পড়ে খান্ খান্ হয়ে গেছে। এবং আমিই হয়েছি তার প্রধান উপলক্ষ্য। এ আমার দুর্ভাগ্য—এ আমার সব চেয়ে বড় লজ্জা।

আজ নিজের ওপরে আসে চরম ধিক্কার, আমিই হয়েছি এতবড় সর্বনাশের মূল। নিজেকে বাঁচাবার জন্য আমার যারা সবচেয়ে বড়, সবচেয়ে আপন—তাদের চরমতম লাঞ্ছনা আর দুর্দিনের মুখে ফেলে পালিয়ে এসেছি স্বার্থপরের মত! এর চেয়ে আত্মহত্যাই ছিল ভালো। চোখের ওপর এই দৃশ্য দেখতে হত না তা হলে।

কান্নায় অনুশোচনায় অন্তর ভেঙ্গে আসে। জয়ন্তর কোলে মাথা রেখে ফুপিয়ে কাঁদতে থাকি।

—"এর চেয়ে মরাও যে ছিল ভালো।"

জয়ন্তর কথাগুলো আজও মনে আছে আমার। সেই কথাগুলোই দেয় আমাকে বাঁচবার প্রেরণা—ব্যর্থ জীবনে আবার বাঁচবার সার্থকতা খুঁজে পাই।

"অপরাধ তোমার নয় মিনু, তুমি মরে গেলেও কি ওরা রেহাই পেত এই দুর্ভাগ্য থেকে? বেঁচে থাকার দরকার আছে, নিশ্চয়ই কোন কাজে লাগবে ওদের একদিন। মরতে কতটুকু সময় লাগে, ইচ্ছে করলেই মরা যায়। কিন্তু ইচ্ছে করলেই বাঁচতে পারে না কেউ, বাঁচবার জন্য সাধনা করতে হয়।"

রূপ নিয়ে গরীবের ঘরে জন্মানই অপরাধ! তাই, আমিই হয়েছি ওদের সর্বনাশের মূল।

"চল—খেয়ে নেবে চল।" জয়ন্তর ডাকে মুখ তুলে চাইলাম। মাথার চুলের মধ্যে হাত বুলোচ্ছে জয়ন্ত। আজ সারা ইন্দ্রিয় দিয়ে অনুভব করি বাঁচবার সার্থকতা আছে—আমিও নিরর্থক আসিনি এই পৃথিবীতে।

"নিজেকে ছোট করে দেখ না মিনু! তুমি ত কোন অপরাধ করনি। যারা তোমাকে অপরাধী করে তুলেছে তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়াতে হবে তোমাকে। এই তোমার জীবনের সার্থকতার পথ।"

জয়ন্তর কথাগুলো ভাবি।···কিন্তু কতটুকু আমার শক্তি। যারা আমার ওপর, বাবা, সকলের ওপরই চালাচ্ছে প্রভুত্বের বিজয় প্রতাপ—আমার দুখানা হাত দিয়ে কতটুকু প্রতিরোধ করতে পারব তাদের।

মায়ের কথা ভাবতে পারি না। আমার মা আজ এই চরম আঘাত কি ভাবে নিয়েছে—সে কি সহ্য করতে পেরেছে? তার কোমল মন হয়ত ব্যথায় রঙীন হয়ে গেছে।

কোথা দিয়ে রাত কেটে গেল। বিনিদ্র রজনীতে আকাশের দিকে চেয়ে দেখি কত আলোর রোশনাই, তবু মাটির বুকে ওর আলো পৌছে না। এ যেন আমাদের প্রচেষ্টা। সারা বুক জোড়া আমাদের জ্বালা— তবু ওদের অত্যাচারের তমসা পার হয়ে একফালি আলোও প্রবেশ করেনা ওদের মনে।

পরদিনই আবার বেরিয়ে পড়লাম আমাদের বাড়ীর দিকে। মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদলে হয়ত খানিকটা লাঘব হবে আমার ভার। এ বিপদে মায়ের কাছে থাকতে চাই—মাকে ফেলে কোথাও যাবো না আর। দুর্বার লজ্জা যেন পথ আটকে দাঁড়ায়—যেতে পারি না।

মনে হয় আমার দুঃখ বেদনা অপমান আমার নারী হৃদয়ের সমস্ত সুকোমল বৃত্তিকে হত্যা করেছিল, ভালবাসা আমার কাছে নির্বাসিত হতে চলেছে—তাই জয়ন্তকে হয়ত সুখী করতে পারব না। আমার মনের সমস্ত জ্বালাময় অতীতকে যদি ভুলতে পারতাম তাহলে হয়ত একজনকে নিঃশেষে ভালবেসে সুখী হতে পারতাম, কিন্তু তা হবার নয়।

নিচু রাস্তাটা চলমান কয়লার কালিমাখা জনতায় ভরে গেছে। মাটির অতল থেকে বার হয়ে আসছে ওরা। কালো চেহারায় কুশ্রী রসিকতা করতে করতে চলেছে নারী পুরুষ, কারুর বগলে কয়লার ঝুড়ি কুচো কয়লা বোঝাই করা, কেউ বা একটা কেরোসিন কুপী নিয়ে চলেছে।

হঠাৎ জনতার মধ্য থেকে কাদের দেখে আমি চকিতের মধ্যে আড়ালে সরে গেলাম। ওদের মাথা নীচু—মুখে চোখে পরাজয়ের গ্লানি, কয়লার কালো কষকেও ছাপিয়ে উঠেছে পরাজয়ের কালিমা ওদের সারা মুখে চোখে।

মা, মন্টু—চোখের সামনে ভেসে ওঠে আমাদের গ্রামের দিনগুলো, লাল শাড়ী পরা সিঁদুর রঞ্জিত ললাটে দাঁড়িয়ে আমার মা, দ্যুতি মাখা চাহনিতে চেয়ে রয়েছে আমার ভাই। সেই শান্ত গৃহাঙ্গণ। আজকে কয়লার কালিতে সেই মহিমাময়ী মূর্তি কোথায় বিলুপ্ত হয়ে গেছে!

আর বাকী রইল কি?

বাবা মদ্যপ উন্মাদ, মা আমার সাধারণ মালকাটা কামিন, ভাই স্কুল ছেড়ে বার হয়েছে অন্নের সংস্থানে ওদেরই মধ্যে—আর আমি? ওদের চোখে কুলটা ভ্রষ্টা।

সংসারের অস্তিত্ব আজ কোথায়? শুধুই কাঠামো—রং মাটি

খসে যাওয়া কোন প্রতিমার কঙ্কাল। আজ শুধু স্মরণ করিয়ে দেয় অতীতের শঙ্খ বাদ্য মুখর কোন উৎসবের এক শুভ দিনকে—যার কোন অস্তিত্বই আজ নেই।

ওকি? হঠাৎ একি ঘটে গেল। চারিদিকে লোক জুটে গেছে, ওরা হাসাহাসি করছে। কে যেন বলে ওঠে সাবাস মরদ!

মা ছুটে যায় ওদিকে। মন্টু হ্যাঁ মন্টুই একটা পাথর তুলে নিয়ে বাবাকেই আঘাত করেছে। অনাহার ক্লিষ্ট চেহারা, কাল সন্ধ্যায় দেখা সেই বেশ; কপাল দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে বাবার। মা যেতেই দুজন দুদিকে সরে গেল—ভিড়ে কোথায় মিলিয়ে গেল দেখা যায় না, মন্টু মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদছে। চারিদিকে কৌতূহলী জনতা। ওদের মধ্যে আমার ঠাঁই নেই। অনুভব করি আজ—মন্টু, মা কেউ বাবাকে ক্ষমা করতে পারেনি। হয়ত বাবাকে ওরা ভুল বুঝেছে। সেই ভুল বোঝার অভিমান—আমার দেওয়া আঘাত বাবার মত লোককে আজ এইখানে নামিয়ে এনেছে।

শত চেষ্টা করেও মা মন্টুর কাছে যেতে পারলাম না। ওরা বাবাকে ক্ষমা করে নি। আমাকে কি ক্ষমা করতে পারবে? ওদের লজ্জার ভার আর নাই বা বাড়ালাম।

সেদিন জয়ন্তের কাছে ধরা পড়ে গিয়েছিল আমার অন্তরের দৈন্য, আমার বুকজোড়া জ্বালা। ওকে সুখী করতে পারিনি। আমার নিজের জগতই আমার মনকে এভাবে নাড়া দিয়েছিল যে নিজেকেই ভুলে গিয়েছিলাম।

"তুমি ফিরে যাবে ওদের কাছে মিনু?"

যাবার মুখ বা সাহস কোনটাই আমার নেই। ওদের সংসার মানে আজ ওই পথ, হয়ত আমার স্বার্থপর নারীমন তাতে সায় দেয় নি।

"তবে চল এখান থেকে দূরে সরে যাই, চোখের সামনে ওদের এই কষ্ট দেখে তুমি ঠিক থাকতে পারছ না।"

তাতেও সায় দিতে পারি না। যদি কোন ক'জে লাগি। ওদের চরমতম দুর্দিনে হয়ত কাজে আসতে পারবো, এই দোটানায় পড়ে কি যে মানসিক বিপর্য্যয়ের মুখোমুখী হয়ে রয়েছি তাকে কিই বা জানাবো। তবু জয়ন্তকে অসুখী করতে পারব না, তার কাছে আমি ঋণী।

কয়েকদিন পর গেছি আমাদের পুরাণো বাসায় একান্ত সঙ্গোপণে সঙ্গে কিছু টাকা নিয়ে। মায়ের সঙ্গে দেখা করব, মায়ের এ কষ্ট আর সহ্য করা যায় না। আবার শেষ চেষ্টা করব সেই আগেকার দিনগুলো ফিরিয়ে আনতে। জয়ন্তও মত দিয়েছে সানন্দে। আমরা ছাড়া তার আর কেই বা আছে। মনটা অনেকখানি হালকা হয়ে গেছে। এগিয়ে চলি, আজ মায়ের কষ্ট সমাধানের উপায় করেই আসছি, তাই মায়ের সঙ্গে দেখা করতে আজ আর আমার লজ্জা নেই। অনেকদিন পরে যেন মনে গানের সুর আমার বেজে ওঠে একান্তে।

কিন্তু আকাশের আলো সব যেন ম্লান হয়ে আসে। একটা দম্‌কা হাওয়া বোঁ বোঁ শব্দে ঘূর্ণিপাকে এগিয়ে আসছে—তার বুকে একরাশ ঝরাপাতার অট্টহাসি। আমি যেন স্বপ্ন দেখছি।

আমাদের পুরোণো বাসাতে এসেছে সম্পূর্ণ অপরিচিত একটি পরিবার, দরজা খোলা পেয়েই ঢুকে পড়েছিলাম তাই একেবারে ওদের কাছে গিয়ে হাজির হয়েছি।

বাড়ীর সকলের চোখে মুখে বিস্মিত চাহনি, আমার মা বাবা ভাই কোথায় গেল তারা? আমারই বয়সি একটি বৌ এগিয়ে এসে প্রশ্ন করে "কাদের খুঁজছেন আপনি?"

তার ডাকে বাস্তবে ফিরে এলাম। কিছুক্ষণ তার দিকে চেয়ে থেকে ধীরে ধীরে আবার বাইরে পা বাড়ালাম। এ বাড়ীতে আর

আমাদের কিছু নেই। আমার মায়ের চিহ্ন—আমাদের স্বপ্ন রঙ্গীন দিনগুলো কারা যেন নিঃশেষে মুছে দিয়েছে।

মা বাবা মন্থ—কোন খবরই রাখে না এরা। ওদের জোর করে এবাড়ী থেকে বার করে দিয়েছে কোলিয়ারী কোম্পানী।

গলির সামনের দোকানদার আমাকে দেখে চিনতে পারে, আমার দিকে এগিয়ে আসে সে, চোখে মুখে তার করুণা মাখা চাহনি।

"সব কই কো হিয়াসে নিকাল দিয়া উলোক। মন্থ-মা দোনো কাহা চলা গিয়া মালুম নেহি আউর—"

কি যেন বলতে গিয়ে থেমে গেল সে। কথাটা যেন বলতে ওর লজ্জা বোধ হয়। প্রশ্ন করি—"বাবাকে দেখেছো?"

কাহিনী শুনে স্তম্ভিত হয়ে যাই। লোকেও বিশ্বাস করে না, আমি ত করতেই পারি না। আমার বাবা চোর? চুরির দায়ে ম্যানেজার তাকে পুলিশে দিয়েছে।

"ই কভি হো নেই সকতা হ্যায় জিজাজী। হমলোক আদমী পহছন্‌তা হ্যায়। পিতাজীকা নোকরী চলা যানে কা বাদ দিমাগ খারাপ হো গিয়া থা, লেকিন চোরি কভি কর নেহি সকতা হ্যায়। ক্যা জানে ক্যা হোগা নসিবমে!"

আমারই জন্যে এতবড় সর্বনাশ আজ অনুভব করতে পারি। বাবার চাকরি যাবার কারণ আমিই, তারপর একটার পর একটা এসেছে ঝড়—সব কিছু উড়িয়ে নিয়ে গেছে।

খেতে ইচ্ছা করে না। বাবা আজ চুরির বদনামে হয়ত জেলে, কে জানে মা, আমার ছোট ভাই কোথায় কিভাবে দিন কাটাচ্ছে। আর যার জন্য এদের হল এতবড় বিপর্যয়—তার মুখে আজও অন্ন ওঠে, আজও সে রাত্রি কাটায় শান্তিতে।

কিন্তু এক এক সময় ভাবি যারা এতবড় সর্বনাশটা করল তাদের কোন

জবাবই দিলাম না, মুখোমুখি বোঝাপড়া করতে সাহসী হলাম না তার সঙ্গে—যে অম্লান বদনে একটা পরিবারকে ধ্বংস করে দিল।

এখানকার ইতিহাস শেষ হয়ে আসছে। বাবা চলে যাওয়ার পর মা মন্থ বোধ হয় চলে গেছে এ-মাটি থেকে অন্যত্র, যেখানে মিলবে একটু আশ্রয়, একটু ঠাঁই, দুমুঠো অন্ন। আমিই বা এখানে অতীতের ইতিহাস আগলে একা পড়ে থাকবো কি করে? আজ বুঝলাম আমাদের জীবনের পথ দুদিকে মোড় ফিরে গেছে। জয়ন্তকে বলি—

"চল এখান থেকে চলে যাই আমরা।"

জয়ন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকে আমার দিকে। কথাটা যেন বিশ্বাসই করতে পারে না সে। ব্যাকুল হয়ে আবার বলি—"এখানে থাকলে দম বন্ধ হয়ে মারা যাবো, যেখানে হোক এ জায়গা ছেড়ে নিয়ে চল আমাকে।"

অতীতকে ভুলে আজ ভবিষ্যৎকে নিয়ে বাঁচতে চাই আমি।

যাবার আয়োজন করছে জয়ন্ত। চাকরি একটা ঠিক করে ফেলেছে—কলিয়ারীতে আর নয়, দামোদর ভ্যালীর অফিসে, বাংলার সীমান্ত ছাড়িয়ে বরাকরের ওপারে। সেই ভালো, এ কয়লার রাজ্যে আর নয়—মানুষের মাঝে বাস করতে চাই আমরা।

পরশু দিনই চলে যাচ্ছি। জিনিষপত্র গোছান হয়ে গেছে। নতুন দেশ পাহাড় নদী সবুজ বনে ঘেরা শান্ত পরিবেশ—মনটা আগে থেকেই ছুটে যেতে চায় সেখানে।

বিকেল বেলাতেই সেদিন ফিরে আসে জয়ন্ত। বাড়ীতে পা দিতেই তার মুখ চোখ দেখে অনুভব করতে পারি কেমন যেন থমথমে ভাব। কোথায় হয়ত একটা ঝড় উঠেছে।

"একটু চল আমার সঙ্গে।"

"কোথায় ?"

"চলনা। তৈরী হয়ে নাও তাড়াতাড়ি।"

তার কণ্ঠস্বরে একটা আতঙ্কের আভাস—তাড়াতাড়ি করে তৈরী হয়ে নিযে বেরুলাম। ওপাশের কুলি বস্তি ছাড়িয়ে নোংরা জলের নালার পাশ দিয়ে চলছি, এদিকে কোন ভদ্রলোক কেন গেরস্থ মালকাটারাও বাস করতে আসে না। কয়লাচোর কাঠকয়লা-ওলারা—না হয় নিম্নশ্রেণীর দেহ পসারিণীরাই ভিড় জমিয়েছে এখানে।

সন্ধ্যার অন্ধকারে আমরা ওই গলির ভিতরে ঢুকলাম। সারা মনে একটা আতঙ্ক—কোথায়, কেন চলেছি জানি না। জয়ন্তকে জিজ্ঞাসা করলেও উত্তর পাই না। এমনি এক সন্ধ্যায় বাবার সঙ্গে গিয়ে মুখোমুখী হয়েছিলাম চরম বিপদের, আজ আবার কোথায় কোন সর্বনাশের মুখে চলেছি কে জানে! বুক কাঁপছে, পা দুটো চলতে চায় না।

একটা অন্ধকার নুয়ে পড়া খোলা ঘরের সামনে এসে দাঁড়ালাম। ভিতরে কাদের কান্নার শব্দ। একটা খাটিয়াতে শুয়ে রয়েছে একটা ছেলে, চেনা যায় না। মুখচোখ তার বিকৃত হয়ে গেছে, সর্বাঙ্গে রক্তের দাগ।

আর্তনাদ করে উঠি—"মন্টু আমার মন্টু!"

কয়লার একটা চাপ ধ্বসে পড়েছিল ওর ওপর। পিষে ফেলেছে ওর ফুলের মত দেহটা…

সারা শরীরে অনুভব করি অসহ্য এক জ্বালা। শিরায় শিরায় প্রবাহিত হয় উষ্ণ রক্তস্রোত। মাথাটা কেমন টলছে। একটা ছেলে বলে চলেছে—

"ম্যানেজারকে লুকিয়ে ওকে নিয়ে পালিয়ে এসেছি। সে দেখতে

পেলে আসতেই দিত না। ওই নীচেই রেখে দিত, কেউ জানতেই পারত না ওর খবর।"

ম্যানেজার! চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই ঝড়ের রাত্রি··· এক পশুর লালসামাখা চোখের চাহনি। বাবার মাতাল অবস্থা। মা মন্থ—সেই সোনার সংসার!···কেমন যেন সব গোলমাল হয়ে যায়। সব কিছু ছাপিয়ে ভেসে ওঠে শয়তানের সেই তীব্র চাহনি। সমস্ত আঘাত সহ্য করেও লুকিয়ে ছিলাম—আজও কি সহ্য করতে হবে এই সর্বনাশ নেহাৎ ভাগ্যের পরিহাস বলেই। আমার যৌবন পুষ্ট শরীরের রক্তে আজ জোয়ার আসে। বাবা মা সহ্য করেছে মন্থ সংগ্রাম করেছে, ওরা দুর্ভাগ্যের সঙ্গে সংগ্রাম করে পরাজিত হয়েছে। আমি ত অতীতের নই, বর্ত্তমানের—আগামী দিনের—তবে কেন এর প্রতিবাদ করব না? কিন্তু—

ভাবতে পারি না, সকলের অগোচরে বেরিয়ে পড়ি। মা গেছে ডাক্তারের কাছে, আমি রাস্তায় এসে...দ্রুত গতিতে এগিয়ে চললাম সামনের দিকে।

কলিয়ারীর অফিসের কাছে এসে দাঁড়ালাম। উত্তেজনায় হাঁপাচ্ছি। কিন্তু দমিনি একটুও, অন্তর জ্বালা দ্বিগুন হয়ে উঠেছে। ধীর পায়ে প্রবেশ করলাম অফিসের মধ্যে। কাচের দরজাটা ঠেলে ভিতরে গিয়ে দেখি ম্যানেজার মেঝেতে কতকগুলো টাকা কুড়োচ্ছে। এ দৃশ্য আমি জানি। আমাকেও অমনি কয়েকটা টাকা হাতে দিয়ে সে রাত্রে বর্বরের মত আক্রমণ করেছিল ও। আজও হয়ত আর কারুর জীবনে এনেছে তেমনি সর্বনাশ। আমার দিকে চাইতেই একটু বিস্মিত হয়ে যায়, চিনতে পেরেছে বোধ হয়।

"তুমি?—এখানে কি চাও?"

চারিদিকে চোখ বুলিয়ে নিই। টেবিলের ড্রয়ারটা খোলা,

কাগজের মধ্যে পড়ে রয়েছে চকৃচকে একটা কি! চোখের সামনে ভেসে ওঠে বাবার সেই মূর্ত্তি—মন্থুর রক্তাক্ত বিকৃত দেহটা—মায়ের বুকফাটা আর্তনাদ, রক্তে যেন সব কেমন রাঙ্গা হয়ে গেছে। কখন যে ওরই রিভলবারটা তুলে নিয়েছিলাম জানি না। ও চকিতের মধ্যে লাফ দিয়ে এগিয়ে আসে আমার দিকে। আমিও চীৎকার করে উঠি। হাতটা ধরে ফেলেছে আমার...কি হয়ে গেল বুঝতে পারি না—একটা প্রচণ্ড শব্দ! ম্যানেজারের মুষ্টি শিথিল হয়ে আসে। একটা অস্ফুট আর্ত্তনাদ করে বুকটা চেপে ধরে চেয়ারের ওপর হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায়। বার কতক উঠবার চেষ্টা করেই মেঝেতে ছিটকে পড়ে ওর দেহটা। ওর হাতের ফাঁক দিয়ে চুঁইয়ে পড়ছে রক্ত—লাল হয়ে গেছে সার্টটা। কয়েকজন লোক ছুটে আসে···সেই দিনকার হাজিরী বাবুও। ততক্ষণে আমার হাত থেকে খসে রিভলবারটা পড়ে গেছে মেঝেতে।

এতক্ষণে উত্তেজনা কমে আসে, প্রতিবাদ আমি করেছি। এতদিনের সঞ্চিত বিক্ষোভ আজ প্রকাশ-পথ পেয়েছে বোধ হয়। ওরা আমাকে টেনে এনে একটা ঘরে বন্ধ করে রাখে।

... ...

কয়েকটা মাস কেটে গেছে। কেটে গেছে জেলখানার সেলে। এতদিন পর নিজেকে একলা পেয়ে অনুভব করি আমার জীবন ব্যর্থ হয়নি। একটা স্ফুলিঙ্গের সার্থকতা—ক্ষণিকের একটু দীপ্তি! ওইটুকুই তার জীবন। সেদিক থেকে আমি সার্থক। একটা আঁচড় কেটে গেলাম দুনিয়াতে—রক্তের অক্ষরে সাক্ষর রেখে গেলাম প্রতিবাদের খতিয়ানে।

মন্থু মা বাবা জয়ন্ত সবাই এসেছিল বিচারালয়ে। উকিল বলেছিল

আমায়—"স্বীকার করো তোমার ওপর অত্যাচারের চেষ্টা করেছিল ও, আত্মরক্ষার জন্য, সম্মান রক্ষার জন্য, বাধ্য হয়েই ওই কাজ করে ফেলেছিলে। জেল হবে সত্যিই, এর বেশী কিছু হবে না।"

আমি রাজী হইনি। ও যেদিন চরম অপমান করেছিল আমার—সেদিন ত' চোরের মত পালিয়েছিলাম। আজ বুঝে সুঝেই এসেছিলাম ওর একটার পর একটা অত্যাচারের প্রতিবাদই করতে।

ওরা আপোষ মেনে নিতে পারে, কিন্তু আমার রক্তে নতুনের জোয়ার—তাই আমি প্রতিশোধ নিয়েছি।

মনে হয় একটি জীবনের বিনিময়ে আজ আমি মন্টুকে বাঁচাতে পেরেছি। তাই আজ মন্টুর চোখে আমার জন্য অশ্রুধারা।

"কাঁদিস না মন্টু!"

মন্টুর অশ্রু বাধা মানে না। তার মনে আজ সব সংশয় কেটে গেছে। দিদিকে সে ভুল বুঝে ঘৃণাই করত। সমস্ত বিপদের মূলে তার দিদিই, সেইই তাদের বিপদের মুখে ফেলে দিয়ে পালিয়ে গিয়েছিল। কিন্তু সেই দিদিই আজ এগিয়ে এসেছে, বুক পেতে নিয়েছে সব দুঃখ, আঘাত—নিজের জীবনের বিনিময়ে। তাই মন্টুর চোখে আজ অশ্রু কোন বাধা মানে না।

আমিও কেঁদে ফেলি—সমস্ত কঠিন কঠোর ভাব ওর চোখের জলের সামনে ভেসে যায়।

"তুই আর কোন দিনই ফিরে যাবি না দিদিভাই?"

উত্তর দিতে পারি না, অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠ! ওকে কাছে টেনে নিই, ওর কপালে ঝরে পড়ে আমার উষ্ণ অশ্রু।

আজ বাঁচতে ইচ্ছা করে। জয়ন্তকে দেখলে সারা মন হাহাকার করে ওঠে! কত সন্ধ্যার কত স্পর্শ, কত মায়াজাল বোনা কাঙ্গাল মনের দুরন্ত প্রয়াস। তাই জয়ন্তকে বলি—

"তোমাকে সুখী করতে পারিনি, এ কত বড় পরাজয় তুমি বুঝবে না। জীবনে এই আমার চরম দুঃখ রয়ে গেল।"

জয়ন্ত কথা বলে না। ওর চোখ আজ হারানোর ব্যথায় ছলছল করে ওঠে। ওর হাত দুটো আমার হাতে। জেলের প্রাঙ্গণে অশ্বত্থগাছের পাখীগুলো আবার গাছেই ফিরে এসেছে, তাদের নীড় বাঁধার কাকলীতে সন্ধ্যা আকাশ মুখর! দু' একটা সাঁঝের তারা করুণ চোখে চেয়ে রয়েছে আমার দিকে।

আর কোন দিনই দেখব না ওদের—আর কোনদিনই কানে আসবে না পাখীর ও কলধ্বনি। যে জগতের যাত্রী আমি সেখানে কি পাখী ডাকে—তারার রোশনী কি দেখা যায়—দেখা যায় কি আর একজনের চোখে বিচ্ছেদের অশ্রু রেখা!

"মিনু!"—

দুটি কথা—একটি ডাক! কানে কানে এইটুকু নিয়েই তৃপ্ত হয়ে যাবো আমি। ললাটে একটু উষ্ণ স্পর্শ। জীবনে কোন ক্ষোভ আমার রইল না।

"বাবা, মা, মনু রইলো, ওদের দেখো।"

হাতে নিবিড় ভাবে চাপ দেয় জয়ন্ত।

"তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে যাও মিনু! তোমার মৃত্যু ব্যর্থ হবে না। ওরা আশ্রয় পাবে, তোমার কথা আমি রাখবো!"

পৃথিবী থেকে শুধু কুড়িয়ে নিয়ে গেলাম—ঘৃণা অপমান নয়, একজনের নিঃশেষ উজাড় করা ভালবাসা। এ যেন আমার জীবনের বোঝা বাড়িয়েই দিল। এই সঞ্চয় নিয়ে মৃত্যুকেও আমার কোন ভয় নেই, মরণকে জয় করতে আমি পারবো নিশ্চিন্তে।

সময় হয়ে গেছে, ওকে চলে যেতে হবে—জয়ন্ত চলে যাচ্ছে।

"একটু দাঁড়াও!"

ও দাঁড়াল থমকে।

"শেষ বারের মত তোমাকে প্রণাম করে নিই"—ওর হিম শীতল পায়ের কাছে মাথাটা স্পর্শ করি।

জীবনের শেষ রাত্রি! আমার কাহিনী ফুরিয়ে এল! আমার পরে আজ যারা রইল এই পৃথিবীতে তারা বিচার করবে আমি দোষী না নির্দোষ। কিন্তু, এ ছাড়া তখন আর কোন পথ পাইনি আমি।

রাত্রি শেষ হতে আর দেরী নেই…অশথগাছের ডালে আবছা কাক-জ্যোৎস্নায় চীৎকার করে ওঠে প্রভাতের আলো-প্রত্যাশী বিহগ দম্পতি…কাদের পায়ের শব্দ আঙ্গিনায়। বুটের ছন্দোবদ্ধ আওয়াজ এই দিকেই এগিয়ে আসছে। আমার সেলের দরজায় এসে থামল। সশব্দে খুলে গেল লৌহকপাট। অন্ধকার ভেদ করে আমার মুখের ওপর এসে পড়ল জোরালো এক ঝলক আলোক রশ্মি। উঠে দাঁড়ালাম। আমার জীবনের শেষ মুহূর্ত্ত আমার গণনার মধ্যে এসেছে।

এগিয়ে চললাম মঞ্চের দিকে…জীবনের শেষ কয়েকটি পদক্ষেপে আমার অস্তিত্বের স্বাক্ষর রেখে গেলাম ওরই সোপানে সোপানে।

—জয়ন্ত—

প্রথম যেদিন দেখলাম মিনুকে সেদিনকার কথাটা আজ বার বার মনে পড়ে। আমার জীবনে সে যেন এক পরম লগ্ন—সে দিন তা বুঝতে পারিনি।

মরুভূমির মাঝে সেই ছিল আমার কাছে শ্যামল ছায়া ঘেরা একটু মরুদ্যান। বনতুলসীর ঝোপে ঘেরা ইষ্টিশানে দুপুরের জোরালো রোদ অগ্নিকণা বৃষ্টি করছে, ট্রেণ থেকে ওদের নামতে দেখে নেহাৎ কৌতূহল বশেই এগিয়ে গেলাম। অসহায় ভদ্রলোক বিপদে পড়েছেন··· আমাদের পাশের গ্রামেরই বাসিন্দা—দূর দেশে তাঁকেই যেন পরম আত্মীয় বলে মনে হল। আশ্রয় দিলাম।

কিন্তু অহরহ দুটো কালো ডাগর চোখের নীরব সলজ্জ চাহনি আমাকে উতলা করে তোলে। ধীরে ধীরে কখন যে এতদূর এগিয়ে এসেছিলাম জানি না—আবিস্কার করলাম একটি মধুর সন্ধ্যাবেলায় জীবনের এই অক্ষয় সম্পদের কথা।

নতুন বাড়ীতে উঠে যাচ্ছে মিনুরা আমার বাসা ছেড়ে দিয়ে।

কালই চলে যাবে। কদিন ধরে দেখছি, সময় অসময়ে আমার জন্য সে পথ চেয়ে বসে থাকে···আমাকে না খাইয়ে নিজেও খাবে না।

—"এত রাত হল ফিরতে ?"

ওর মুখের দিকে চাইলাম। খেয়ে দেয়ে বাইরে বারান্দায় বসে রয়েছি, ও এল কাজকর্ম সেরে। রাত তখন অনেক হয়েছে, কলিয়ারী অঞ্চলটাই যেন ঘুমিয়ে পড়েছে। দূরে দিগন্তের বুকে কোথাও মালার মত সারিবদ্ধ জ্বলছে দু' একটা আলো, রাতের নীরবতা ভেদ করে কানে আসে বয়লারের ভস্ ভস্ শব্দ।

নির্জনতার মধ্যে তারার আলোয় ওর চোখে কি যেন এক ব্যাকুলতা, আমার হাতখানা ওর হাতে।

"আমরা চলে যাচ্ছি কাল।"

—"শুনলাম।" আমার মনেও কি যেন একটা ব্যথা-কাতরতা। জীবনে স্নেহ প্রেম প্রীতি সেবা বিশেষ কিছুই পাইনি। বড় একা—এরা দু দিনের জন্য এসে যেন আমাকে জয় করে নিয়েছে, বিদায় দিতে তাই কেমন ব্যথা পাই।

ওর চোখে অশ্রুর ঝিকিমিকি—"চলে গেলে খুবই খুসী হও, না ?"

"কেন ?"

"একবারও থাকতে বল্লে না ?"

"ইচ্ছে করলেই কি কাউকে ধরে রাখা যায় মিনু ?"

বিস্মিত হয়ে যাই মিনু কাঁদছে—দুর্বার আকর্ষণে ওকে কাছে টেনে নিই, কঠিন দুই বাহুর মধ্যে। নীরবে সে আত্মসমর্পণ করে। বুকে মাথা রেখে কাঁদতে থাকে। সান্ত্বনা দেবার ভাষা পাই না।

"দূরে ত আর যাচ্ছ না, প্রায়ই যাবো—দেখা হবে।"

অশ্রুভেজা কণ্ঠে...ভোরের পাখীর প্রথম কাকলির সুরে বলে ওঠে ও—"যাবে তুমি ? না ভুলেই যাবে আমাদের।"

চিবুক ধরে ওর মুখখানাকে আমার চোখের সমান্তরাল করে তুলি। ডাগর দুটো চোখে কি যেন আকুতি।

"না-না। ভোলা কি এত সহজ।"

ওরস্পর্শে, ওর উষ্ণ নিশ্বাসে আমার সমস্ত শিরা উপশিরায় যেন তুফান তোলে। সমস্ত পৃথিবী যেন চাঁদের আলোয় আর রজনীগন্ধার সুবাসে প্লাবিত হয়ে যায়—দূরে কোথায় রাতজাগা কোকিল ডেকে ওঠে।

কতক্ষণ এই স্বপ্নঘোরে ছিলাম জানি না, ধীরে ধীরে ও সরে

দাঁড়ায়। ওর চোখে কি যেন নেশামাখানো। বকুল ফুলের বনে যেন ভ্রমরের প্রথম গুঞ্জন ধ্বনি!

সেই রাতের স্মৃতি আজও অমলিন হয়ে আছে—সেই রাতেই সে আমাকে নিঃশেষে জয় করেছিলো—আমার যাযাবর মনকে সেই বাঁধন পরিয়েছিলো।

দিন দিন সেই বাঁধন একটার পর একটা আমাকে অলক্ষ্যে জড়িয়ে নিবিড়ভাবেই বন্দী করেছিল। আমার অন্তরে সে প্রতিষ্ঠিত করেছিলো তার আসন প্রতিদিনের স্পর্শ দিয়ে।

তাই বোধ হয় যেদিন তার ঘটেছিল চরম অপমান—যেদিন সে নিজের বাবা-মা কাউকে বিশ্বাস করতে পারেনি—পৃথিবীর রূপ বদলে গিয়েছিল তার সামনে, সেদিন সে ছুটে এসেছিল আমারই কাছে একটু আশ্রয়ের জন্যে।

আমিও ঠিক চিনতে পারিনি তাকে। তাই প্রথমে জবাবই দিয়েছিলাম, কিন্তু শেষকালে রাজী হলাম তার চোখের জলে—তার অসহায় অবস্থার কথা শুনে। পৃথিবীতে যে কেবল আঘাতই পেল, পেল শুধু লাঞ্ছনা, তাকে সান্ত্বনা দেওয়া ত মানুষেরই কর্তব্য।

সে আমাকে নিঃশেষে জয় করেছিলো, কিন্তু আমি হয়ত পারিনি। তাই শেষ পর্য্যন্ত তাকে আমার দাবীর জোরে বাঁধতে পারলাম না। সে এমনি করে নিজেকে নিঃশেষ করে দিয়ে বিদায় নিয়ে গেল পৃথিবী থেকে। হয়ত আমার উপর অভিমান ভরেই!

জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত সে চোখের জল ফেলে গেল আমার সামনে। মরবার আগের সন্ধ্যায় আমারই পায়ে মাথা রেখে ফুঁপিয়ে কাঁদতে থাকে—কি এক ব্যর্থ বেদনায় সে গুমরে উঠেছিলো।

"জীবনে তোমাকে সুখী করতে পারলাম না, পারো আমাকে ভুলে যেও—ভুলতে চেষ্টা করো—"

আমার সমস্ত দোষ—সমস্ত অবহেলা একান্তই আপনার করে নিতে চায়।

কিন্তু পারি কৈ? তার অশ্রু ব্যর্থ হয়ে গেল, জীবন ব্যর্থ হয়ে গেল। মনু—মা ওদের দিকে চাইতে পারি না। ওর বাবা যেন পাথর হয়ে গেছে!

—"এমনি করে সর্বনাশ হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি জয়ন্ত।"

ওদের সান্ত্বনা দেবার ভাষা আমার জানা নেই। মনু নীরবে কাঁদছে। ওকে বুকে টেনে নিই। ওরা আমার কে? কেউ নয়—তবুও কোন অদৃশ্য বাঁধনে ওদের সঙ্গে যেন নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছি। এ বাঁধন খোলবার নয়—মিনুর আত্মা শান্তি পাক!

ওদের পরিবারের দুঃখ আজ আমারও দুঃখ।

—"চুপ কর মনু, অমন করে কাঁদতে আছে।"

সহরের জীবন বিষিয়ে উঠেছে। বিষিয়ে উঠেছে কলকারখানা আর কলিয়ারীর দৈনন্দিন জীবনযাত্রা ওদের জীবনে। ওরা আলাদা ধাতের মানুষ—চিরদিনই খেত খামার—জমি জায়গা দেখে এসেছে, তার থেকেই আহরণ করছে ওদের জীবিকা। ওরা এখনও প্রকৃতির সন্তান। ওদের দেহে মনে আজও মাটির আকর্ষণ।

—"এখানে এসে ভুলই করেছিলেন আপনারা?"

রতন ঘাড় নাড়ে—"সত্যি! আমরা এখানকার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারিনি। পারিনি বলেই এমনি করে ছন্নছাড়া ছত্রভঙ্গ হয়ে গেলাম।"

মা বলে ওঠে—"কিন্তু যাবো কোথায়?"

কি যেন ভাবছে রতন।

"দেখি কোন কাজকর্ম্ম অন্য কোথাও চেষ্টা করে, দিনত চালাতেই হবে, এতদূর এগিয়ে আর পেছোন চলে না।"

মনুও সায় দেয়।

"আমিও কায পেয়ে যাবো অন্য কোথাও। এইবার বড় হয়ে গেছি।"

মন্নু ছেলেবেলা থেকেই এই পরিবেশে মানুষ হচ্ছে, ওর ধাতে সহ্য হবে এই জীবন যাত্রা। কিন্তু ওর মা সেই গ্রামেরই মেয়ে, সেই শান্ত নিরলস জীবন যাত্রায় অভ্যস্ত। চোখের সামনে সে দেখছে অভাব অনটন সর্বনাশের কালো ছায়া এ জীবনে কত নিশিদিন ঘিরে এসেছে। তাই আর্ত্তনাদ করে ওঠে—"না—না, ওগো দোহাই তোমার এখান থেকে চল, এখানে আর নয়। আমার মিন্নুকে হারিয়েছি আরও কত দুর্ভোগই না সয়েছি—এ-মাটিতে আর নয়।"

রতন বলবার চেষ্টা করে—"বিন্দু যে মাটিতে পড়ে লোক, ওঠে তাই ধরে, এখানেও ত অনেকে দিন কাটাচ্ছে ছেলেমেয়ে নিয়ে। তাদের সয়েছে তোমার বেলায় সইল না।"

নীরবে বসে ওদের কথাবার্ত্তা শুনি। কিন্তু যাবো বল্লেই ত আর যাওয়া হয় না, পথ কোথায়? সর্বত্র একই অবস্থা, একই ভবিষ্যত অপেক্ষা করেছে ওদের জন্য।

আমার মন বিষিয়ে উঠেছে এই পরিবেশে। ওদের পরিবারের একটা গুরুদায়িত্ব অজ্ঞাতসারে যেন আমার ঘাড়েও এসে পড়েছে। কিছুদিন থেকে চাকরীটার জন্য বাইরে চেষ্টা করছিলাম। মিন্নু তখন বেঁচে, কত আশা করেছিলো সে এই কলিয়ারীর যন্ত্ররাজ্য থেকে প্রকৃতির শ্যামল পরিবেশের মধ্যে গিয়ে সে স্বপ্ননীড় রচনা করবে। আজ সব আশা তার ব্যর্থ হয়ে গেল।

চাকরীর সংবাদ এসেছে কিন্তু মিন্নু কোথায়! অন্য জগতের ছুটির নিমন্ত্রণে সে পাড়ি জমিয়েছে।

"বাইরে একটা চাকরী পেয়েছি, সরকারী কলোনীতে। চলুন সেইখানে গিয়ে যা হয় একটা ব্যবস্থা হবে।"

বাকী কথাটা বলে শেষ করতে পারি না। মন্নুর মার চোখে মুখে দেখি একটা অসহায় ভাব। আমার সাহায্য নিতে তাদের বিবেকে কোথায় বাধছে। পরিষ্কার করে প্রকাশ করতে পারে না, প্রতিবাদও করতে পারে না; তবু যেন না বলেও পারছে না। ব্যাপারটাকে সহজ করে নেবার চেষ্টা করি।

"এর জন্য লজ্জা কি? একদিন ত আমিও আপনাদের সংসারেরই একজন ছিলাম। আজ কি মিনু চলে যেতেই পর হয়ে গেলাম? চলুন সেখানে গিয়ে দেখা যাক না কি ভাগ্য অপেক্ষা করছে! দেখতে দোষ কি?"

এ ছাড়া পথও নেই তাদের সামনে। সবই নতুন পথ...তবু সেখানে একজনের ভরসা পাবে......আমারও দরকার ওদের, মিনুকে যে কথা দিয়েছি সে কথা রাখতেই হবে আমাকে!

মন্নু শুনে যেন লাফিয়ে ওঠে।

"চমৎকার হবে জয়ন্ত দা, সেইখানেই চলুন। অনেক লোকজন বাস করছে...নদীর জলে নাকি মস্ত বাঁধ দিয়ে একাকার করেছে..."

এখানকার একঘেয়ে দৃশ্য দেখে মিনুর চোখ বিষিয়ে উঠেছে। ওর মন তাই নতুনের দিকে যেতে চায়।

"তাই চল মা—"

রতনও ভাবছে—মাটিতেই মানুষ সে, মাটি কখনও বেইমানি করে না। শেষ পর্য্যন্ত সেও রাজী হয়।

"তাই চল জয়ন্ত! মাটিকে ছেলেবেলা থেকেই চিনি জানি। মানুষ বেইমানি করে, মাটি কখনও নিমকহারামি বেইমানি জানে না। তাকে ভালবাসলে তাতে পরিশ্রম করলে তার দাম উঠে আসবেই। একটু জমি যদি পাই জয়ন্ত...এই জীবন বদলাতে পারবো, এমনি করে আর পথে পথে ঘুরতে হবে না।"

মাটির স্পর্শ হারিয়েই এরা যাযাবর হয়ে উঠেছে! মাটির কদর এরা বোঝে।

যাবার আয়োজন হয়ে যায়...জিনিষপত্র এমনই বা কি! তবুও এমাটি ছেড়ে যাবার আগে শেষবারের মত মনটা কেমন করে ওঠে। কত দিনরাত্রির স্মৃতি রইল এর কালো ধুলোর তলে লুকোন, কত পায়ের চিহ্ন পড়েছে এইখানে। মিন্নুর শেষ স্পর্শ লেগে আছে এর কত ঠাঁই। এইখানেই জীবনকে নতুন করে চিনলাম। মিন্নুর ডাগর দুটো চোখের চাহনির মধ্য দিয়ে তাকে ভালবেসে পৃথিবীর অনেক অজানাকেই আপন করলাম!

চোখের জল মুছে বেরিয়ে এল মন্নুর মা, রতন কেমন গম্ভীর হয়ে গেছে···মন্নুর মনে নতুনের আনন্দ। সেই একা খুসির আভায় ঝলমল। ট্রেনের গতিবেগে...পিছনে পড়ে রইল এই দিগন্ত···এগিয়ে চললাম নতুন দিগন্তের পানে।

বহু বিচিত্র এই জীবন···বহুমান্য এই জীবনদেবতাকেও জানালাম নমস্কার। এদের যাত্রা তুমি স্বার্থক করো। মাটি হারিয়ে ওরা সর্বহারা হয়েছে—মৃত্তিকার স্পর্শে···ওদের ব্যর্থ জীবন—সত্য হোক।

নতুন দেশ নতুন দিগন্ত। কয়লার কালো ধোয়ার রাশি এর শান্ত নীল আকাশকে কলঙ্কিত করে তোলেনি। এর নিথর নীরবতার মাঝে বনদোয়েল কোকিলের ডাক ভেসে আসে...কয়লার ক্রুদ্ধ গর্জন মিলের তীক্ষ্ণ সাইরেনে এর স্তব্ধতাকে খণ্ডবিখণ্ড করে তোলে না। চারিদিকে এর অখণ্ড শান্তির ঘন ছায়া।

ইষ্টিশান থেকে নেমে আসে তারা।

রতন বিস্ফারিত নয়নে চেয়ে রয়েছে। তারই ফেলে যাওয়া বন্ধা দেশ আজ নদীর জলধারায় শস্যশ্যামল হয়ে উঠেছে। দিক থেকে দিগন্ত পর্য্যন্ত সবুজের নেশা, যেন কেউ সবুজ রং ঢেলে দিয়েছে

মাটির বুকে। পাহাড়ীর ধারে ছোট নদীর গায়ে সাজান কতকগুলো বাড়ী ছবির মত লাগে।

বুকভরে নিঃশ্বাস নেয় রতন, কেমন একটা বহু পরিচিত গন্ধ! সেই আগেকার সোনাধানের দিন, মনু আর মিনুর কোলাহল মুখর মাঠের সরু আলিপথ।

চোখ জুড়িয়ে যায়। ছোট্ট নদীর উছল জলধারা থেকে আঁজলা আঁজলা জল নিয়ে মুখ চোখ ধুয়ে ফেলে রতন। সমস্ত দেহ মন থেকে সে যেন মুছে ফেলতে চায় অতীতের সেই দুঃখময় দিনের ব্যথা করুণ স্মৃতির স্পর্শ।

বিন্দু বলে ওঠে—"এস!"

আনমনা রতন চমকে ওঠে—"হ্যাঁ যাই।"

মনু তখন গল্প সুরু করেছে আমার সঙ্গে—

"এত ধান কাদের জয়ন্ত দা?"

"সকলেরই, সবাই মিলে এখানে চাষ করেছে একসঙ্গে। যা ধান হয় সবাই তা ভাগ করে নেয়।"

শিশু মনে আসে বিস্ময়—"ওঃ এত ধান, কিন্তু আমাদের ত কিছুই নেই।"

"কাজ করলে আমরাও ভাগ পাবো।"

"সত্যি?" চোখে ওর অবিশ্বাস-আনন্দের স্পর্শ! দুজনে এগিয়ে চলি।

দূর থেকে কানে আসে একটানা গর্জনধ্বনি, আকাশ মাটি যেন থর থর করে কাঁপছে।

"ও কিসের শব্দ জয়ন্ত দা?"

"গেলেই দেখবে। ওর জন্যই এখানে এই ফসল, লোকের বাস, না হলে এখানে আগে কি মানুষ থাকত, না এমনি

ফসল ফলত! এখানে ছিল শুধু শাল গাছের বন, আর পাথুরে মাটি”—

“সত্যি ?”

মাথা নাড়ি। উৎফুল্ল হয়ে নদীর দিকে এগিয়ে চললাম।

পাহাড়ী নদী, তিন মাস মাত্র জল থাকত, দুধার প্লাবিত করে বয়ে যেত গৈরিক জলধারা দুর্বার বেগে। বাকী ন'মাস বালুচর বুকে নিয়ে বিধবার নিঃস্বতায় মগ্ন হয়ে থাকত। এই পূর্ণতার পথ চেয়ে নদীর বুকে বিশাল বাঁধ দিয়ে জল আটকান হয়েছে ; বহু দূর পর্য্যন্ত বিস্তৃত এর সঞ্চিত জলরাশির দিকে মুগ্ধ বিস্ময়ে চেয়ে থাকে রতন—“সাবাস!”

বুক যেন ওর আনন্দে ভরে ওঠে। নীচের লকগেটের ফাঁক দিয়ে গর্জন করে উদ্দাম জলধারা শতধা বিছিন্ন হয়ে ছাড়িয়ে পড়ছে। চূর্ণ জলকণায় রাম ধনুকের রং...চোখ ধাঁধিয়ে দেয়। মনুর চোখে কি যেন নেশা।

“কি সুন্দর দেখছ মা ?”

বিন্দু মুগ্ধ বিস্ময়ে ওই জলরাশি আর দিগন্ত প্রসারী সবুজের দিকে চেয়ে থাকে। ভাষা যেন তার রুদ্ধ হয়ে গেছে। জলধারা ক্ষেতের মধ্য দিয়ে বয়ে গেছে ছোট নদীর আকারে ; শুধু এখানেই নয়, বহুদুর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়ে দুপাশের মৃত্তিকাকে দিয়ে চলেছে ওর স্পর্শ, ফলে ফসলে ভরিয়ে তুলেছে তার রিক্ত বুক। তাদেরই মত কত নিরাশ্রয় যাযাবর ঘর বেঁধেছে এখানে। এর কূলে কূলে আহরণ করছে ধরণীর অকৃপণ হাতের দান···ওই মৃত্তিকার বুক থেকে।

কতক্ষণ ছিলাম জানি না। ওদের সমস্ত চেতনা যেন আচ্ছন্ন হয়ে গেছে। ওদের চোখে সেই আগামী স্বপ্নের নেশা...সমস্ত দুঃখ ওদের ঘুচে যাবে...এমনি রিক্ত নিঃস্ব জীবন যাত্রার মাঝে আসবে আবার পূর্ণতার জোয়ার।

"চলুন—বেলা হয়ে গেল অনেক।"

আমার ডাকে রতন ফিরে চাইল—"হ্যাঁ চল।"

অফিসের দিকে এগিয়ে চললাম, সেখানে গিয়ে বাসার ঠিক হবে···অন্য সমস্ত ব্যবস্থাও করা দরকার। দূর থেকে কয়েকজন লোক চেয়ে রয়েছে, তারাও এগিয়ে এল আমাদের দিকে। তাদেরই একজন নিয়ে চলল আমাদের। বললো—"চলুন আমিও সেইখানেই যাবো। আপনিই বুঝি নতুন মাষ্টার ?"

ঝক ঝক করছে নতুন একতালা বাড়ীটা, লাল সুরকি ঢালা পথের দুপাশে বনঝাউ, পাতাবাহার আর গন্ধরাজের গাছ। নরম মাটিতে সযত্নে লাগান বেলফুলের ঝাড়, ঘনকালো পাতার আড়ালে তার সাদা সাদা কুঁড়িগুলো উঁকি মারে। একটু দাঁড়িয়ে দেখতে ইচ্ছা করে বন কেটে পাহাড়ের বুকে মানুষের হাতের তৈরী এই গ্রাম খানাকে। সবকিছুতেই এখানে ছড়িয়ে রয়েছে মানুষের সাধনার চিহ্ন। দৃঢ় প্রতিজ্ঞার একটা ভাব।

এগিয়ে গেলাম অফিসে।

একটা ঘরে কয়েকজন বসে কাজ করছিল আমাকে দেখে তাদের একজন বেরিয়ে এল। রোদে বাতাসে তার গায়ের রং তামাটে হয়ে উঠেছে। ওর বলিষ্ঠ হাতের শিরাগুলোতে প্রবাহিত প্রৌঢ় রক্তের ধারা, মুখে চোখে দৃঢ়তার চিহ্ন। পকেট থেকে চিঠিখানা বার করে দিলাম।

"আসুন—আসুন, কেমন লাগল জায়গাটা ?"

"চমৎকার, মানুষের গড়া ফসলের দেশ।"

আমাকে নিয়ে অফিসের দিকে চললেন তিনি। পাশের ঘরে অপেক্ষা করে মিনু আর মা। রতন আর আমি চলেছি তার সঙ্গে। লোকটি এই প্রতিষ্ঠানের একজন কর্মকর্তা। সে বলে চলেছে অতীতের কাহিনী

—"মাত্র কয়েকটি পরিবার আর কিছু লোক, সব হারিয়ে সুদূর দেশ ছেড়ে শুধু হাতে এসে দাঁড়ালাম এখানের মাটিতে! ছোট নদীর জল আর নীরস মাটিতে এর তখন ফলত শুধু কেঁদ শাল আর পলাশের বন।

কিছু সরকারী সাহায্য পেলাম আর পেলাম, ওই নদীর জল···। সকলের একান্ত সাধনা আর চেষ্টা দিয়ে আমাদের সমস্ত দুঃখ ভুললাম। এই মাটিতেই ফসল ফলল। বুঝলেন—মাটি কখনও বেইমানি করে না। মানুষ বেইমানি করে, কিন্তু মাটিকে যত্ন করুন, সে তার প্রতিদান দেবেই। জীবনে অনেক দুঃখ আর হতাশা নিয়ে এখানে এসেছিলাম, সকলের পরিশ্রমে সে দুঃখ ভুলেছি।"

আমারও মনে হয় একটা কথা—বিজ্ঞান বা যন্ত্রযুগ মানুষের দুঃখ আনেনি, দুঃখ বিপদ ডেকে এনেছে মানুষ তাকে স্বার্থপরের মত ব্যবহার করেছে বলেই। একদিকের যন্ত্রজীবনে রতন ঘা পেয়েছে ব্যথা পেয়েছে সর্বস্বান্ত হয়েছে; আবার ঠাঁই পেল এমন এক স্থানে যন্ত্র যেখানে মানুষের কল্যাণে নিয়োজিত হয়েছে। নদীর জলধারাকে বাঁধ দিয়ে আটকেছে, পাথুরে মাটির স্তর বুলডোজার ট্রাকটার দিয়ে উপড়ে ফেলে নীচের সরস পলিমাটিকে বার করেছে, ফসল ফলিয়েছে। একদিকে যন্ত্র পিষে নিংড়ে নিঃশেষ করেছে মানুষকে, অন্যদিকে সেই যন্ত্রই তার রিক্ত জীবন পূর্ণ করে দিয়েছে।

বলে চলেছে সে—"বর্ষাকালে লোকজন পাই না, এত জমি অনাবাদি পড়ে থাকবে, নিজেরা দিন রাত মেয়েছেলেদের নিয়ে ধান পুঁতেছি, চড়াদামেও যা লোক পেয়েছি তাদেরও কায দিয়েছি। প্রথম বছরের ফসল অর্দ্ধেক খেয়ে গেল বনশূয়োরে—কতক কাটবার লোক অভাবে মাঠেই নষ্ট হল, তবুও দমিনি। উপযুক্ত কর্মী পেলে, লোক পেলে আমাদের সব অভাব দূর হবে এ বিশ্বাস আজও করি।"

রতনের দিকে চাইলাম। সে ঠাঁই চায়, কাজ চায়, চায় তার পরিবার বর্গের জন্ম একটু শান্তি নির্ভর আশ্রয়। বিনিময়ে সেও পরিশ্রম করবে প্রাণপাত করে।

ইত্যবসরে আমরা এসে পড়লাম লোকালয়ের মধ্যে...সাজান রাস্তা নিখুঁত করে গড়ে তোলা একমাপের বাড়ী, চারিপাশে নানারকমের গাছ তরকারীর ক্ষেত। মাঝে মাঝে সবুজ কলাগাছের ঝোপ বাতাসে মাথা নাড়ছে। তারই মধ্যে ছোট একখানা বাড়ীতে আমার ঠাঁই হল স্কুল বাড়ীর একটু দূরেই।

বিন্দু মনোমত করে সাজিয়ে তুলেছে সংসার। গোবর দিয়ে নিকোন তকৃতকে উঠানের এককোণে তুলসী মঞ্চ। সন্ধ্যাবেলা সে গলবস্ত্র হয়ে প্রণাম করে শঙ্খধ্বনির মধ্যে। দূর থেকে উলুধ্বনির শব্দ শোনা যায়, আরতির শঙ্খঘণ্টা ধ্বনি ভেসে আসে।

মন্থু পড়তে বসে হ্যারকিনের আলোয়।

রতন কাজ সুরু করছে...জমি সে পাবে তার ব্যবস্থাও হয়ে গেছে। লোকনাথবাবু—সেদিনের সেই লোকটি, সেইই দেখে শুনে দাগ নম্বর মিলিয়ে জমির পত্তনি দিচ্ছেন সেই প্রতিষ্ঠানের তরফ থেকে···কিন্তু সামান্ম কিছু টাকা লাগবে প্রতিষ্ঠানকে দিতে···এই নিয়েই মুস্কিলে পড়েছে রতন।

"টাকা কোথায় বল।"

সন্ধ্যা বেলায় বাড়ীর উঠোনে বসে আলোচনা হচ্ছে। উঠোনের কোণে কয়েকটা সন্ধ্যামালতীর গাছ। রঙ্গীন ফুলগুলো ফুটে রয়েছে রাত্রের তারার মত নেশা ভরা চাহনিতে। বিন্দুও ভাবছে। এই পরিবেশ, এই ঘর ছেড়ে আর যেন পথে নামতে না হয় তাদের—কিন্তু কিছু টাকা।

"লেখাপড়া করে দেবে বলেছে?"

আমার প্রশ্নে মুখ তুলে চাইল মন্টুর মা। রতন জবাব দেয় —"টাকাটা দিলেই পাকাপাকি বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। কিন্তু কোথা থেকে দিই বলো ?"

নীরবে কি যেন ভাবতে থাকি সকলেই। ওঘর থেকে মন্টুর পড়ার শব্দ ভেসে আসে গুণ গুণ সুরে। নিরাশ্রয় পরিবারটি কোন স্বপ্নরাজ্যের কল্পনাই দেখছে।

সামান্য কিছু সঞ্চয় ছিল আমার তার থেকেই টাকাটা অফিসে জমা দিয়ে রসিদখানা এনে দিলাম। রতন যেন বিশ্বাসই করতে পারে না। মন্টুর মার চোখে আনন্দ-কৃতজ্ঞতার আভা—"তোমার উপকার জীবনে ভুলবো না বাবা !"

রতন অস্ফুট কণ্ঠে প্রতিবাদ করে—"এতখানি ঋণ তোমার কি করে শোধ করবো জয়ন্ত ?"

"ঋণ কোথায় ? জমিগুলো দেখে নেবেন ভাল করে।"

মাথা নাড়ে রতন—

"জন্ম থেকে মাটি দেখে আসছি মাটির কদর এক নজরেই বুঝতে পারি, দেখে নিও জমিকে কি করে তুলি।"

...আজ বাড়ীতে আনন্দের বান ডেকেছে। মন্টুর পড়া বন্ধ, হৈ চৈ করে ফল মূল কাটতে বসেছে মায়ের সঙ্গে। মা সারাদিন উপবাসী হয়ে সত্যনারায়ণের পূজার ব্যবস্থা করেছেন। রতন পাড়া-পড়শীদের নেমতন্ন করে এল ; সকলের পায়ের ধুলো পড়বে তার বাড়ীতে। নতুন জীবনের আজ সুরু...আজকের দিনটিকে তাই স্মরণীয় করে রাখতে চায় তারা। উঠোনে বা রাস্তায় সতরঞ্চি পেতে অভ্যাগতের জন্য আসন করছে রতন। ধীরে ধীরে বাড়ীর কোলাহল ছেড়ে বার হয়ে এলাম।

পূর্ণিমা তিথি। শরতের শেষ—আসছে হেমন্তের প্রথম স্পর্শ...

দিগন্ত প্রসারী ধানের ক্ষেতে চাঁদের আলো, হালকা কুয়াসার ছিঁটে ফোটা মেঘে চন্দন পরা নব বধূর মত সজীব শ্যামলা হয়ে উঠেছে। খালের জলধারায় উছল চাঁদের কলহাসির শব্দ।

বাগানের বাইরে একটা ক্যালভার্টের উপর বসে আছি। বাড়ীর আনন্দ কোলাহলে ফিরে যেতে ইচ্ছে হয় না। আজ মনে হয় মানুষ বড় স্বার্থপর! স্নেহ প্রেম প্রীতির সম্পর্ক দুদিনের। কই, জীবনের পথ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই রতন মনু ওরা ভুলে গেল একজনকে যে তাদের জীবনের সঙ্গে ওতপ্রোত ভাবে জড়িয়ে ছিল। মিনতির কোন স্মৃতিই আজ কি ওদের স্মরণে নেই! তার নাম পর্য্যন্ত মুখে আনে না। তবে কি ওরা ইচ্ছা করেই তাকে বিস্মৃতির অতলে ঠেলে দিতে চায়! কিন্তু আমি পারি না। এই চাঁদের আলোয় নির্জন পৃথিবীর বিশালতার মাঝে যখনই নিজেকে ফিরে পাই, তখনই মনে হয় কে যেন আমার সমস্ত মন জুড়ে রয়েছে।

কতক্ষণ এই ভাবে বসেছিলাম জানি না, পিছনে কার পায়ের শব্দ পেয়ে ফিরে চাইলাম। এইখানে এই পরিবেশে তাকে দেখবো কল্পনা করতে পারিনি। আমাদের স্কুলের একজন শিক্ষয়িত্রী, ধীরা।

"একা একা সময় কাটে না, চাঁদের আলো দেখে একটু বেরিয়ে পড়লাম, অসুবিধা হচ্ছে না ত আপনার?"

অপ্রস্তুত হয়ে যাই—"না না, অসুবিধা কি হবে?"

"মাঝে মাঝে বড্ড একা বোধ হয়। সকলেই নিজের কাযে ব্যস্ত —কথা বলবার লোক্ পাই না। আপনি ত স্কুলের দক্ষিণের বাড়ীতে উঠেছেন?"

"হ্যাঁ।"

নিজের জীবনের কাহিনীই শুনিয়ে চলে। কথা বলার লোক খুঁজতে গিয়ে বোধ হয় আমাকে পেঁয়ে আজ সব কথাই শেষ করে

ছাড়বে। সব হতে রাজী আছি কিন্তু মেয়েদের কথা শোনার পাত্র হতে রাজী নই।

"চলুন অনেক রাত হয়েছে।"

চাঁদ আকাশের গায়ের দিকে নেমে আসছে...গ্রাম প্রায় নিশুতি হয়ে আসে...রাতের বাতাসে ভেসে আসে নদীর বদ্ধ জলধারার উপছে পড়ার শব্দ...ধীরা উঠে পড়ে—"হ্যাঁ চলুন, অনেকক্ষণ আটকে রেখেছিলাম আপনাকে। বাড়ীতে বকুনি খেতে হবে নাকি?"

হাসি আসে—"না সে সব বালাই নেই, বাইরের ঘরে পড়ে থাকি, চাবি খুলে ঘরে ঢুকব। রাত্রি আটটাও যা একটাও তাই আমার কাছে।"

হাসে ধীরা—"তাহলে আপনি নেহাৎই দুর্ভাগা দেখছি।"

এগিয়ে চলেছে ধীরা। দীর্ঘ দেহ দোহারা চেহারা। সমস্ত দেহে দেহে যৌবনের লাবণ্য ছড়িয়ে। মাঝে মাঝে কারণে অকারণে হাসতে থাকে, হাসির তরঙ্গে বাধন হারা জলধারার মত খোপাটা ভেঙ্গে পড়ে।

"এতটুকু এতটুকু মেয়ের কি দুষ্টমি বুদ্ধি জানেন? অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে থাকুন দেখবেন জানালা টপকে পালিয়ে গেছে। আমি তেমনি চুলের মুঠিটা ধরে হিড় হিড় করে টেনে এনে হাতে ইট দিয়ে নিল ডাউন করিয়ে রাখি। আমার কাছে দুষ্টুমি—"

"আপনিও বুঝি ছেলেবেলায় অত্যন্ত দুরন্ত ছিলেন?"

উছল হাসিতে ফেটে পড়ে ধীরা—"হুঁ, সে অভ্যাসটা এখনও যায়নি, বুঝলেন?"

...বাড়ীর সামনে এসে বলে—"এই রাজকন্যার প্রাসাদ, এক কুলুঙ্গীতে আছে এক সোনার কাঠি আর রূপোর কাঠি, কিন্তু পক্ষীরাজ চড়ে রাজপুত্র কোনদিনই এল না, তাই রাজকন্যার ঘুমও আর ভাঙ্গে না স্কুলের ঘণ্টার শব্দ না শুনলে।"

হাসতে থাকে আমার দিকে চেয়ে, হাসলেই সুন্দর মানায় ওকে, গালের দুদিকে দুটো টোল পড়ে, কাঁপতে থাকে হাসির আবেগে সমস্ত দেহটা।

"আসবেন একদিন—আলাপ পরিচয় ত ভালো করেই হল।"

মাথা নেড়ে সম্মতি জানিয়ে বার হয়ে এলাম রাস্তায়। মনে কোথায় যেন একটা দোলা লাগে। মিনুর স্মৃতির উজ্জ্বল আকাশে এক ফোঁটা কালো ছেঁড়া মেঘের হাতছানি দেখা দেয়। নির্জন পথটা দিয়ে আসছি—আকাশে ছেঁড়া ছেঁড়া সাদা মেঘের আনাগোনা। চাঁদের সাগরে যেন ভেসে চলেছে কোন বিদেশী সওদাগর ময়ূরপঙ্খী নায়ে জাফরাণী রংএর পাল তুলে।

বাড়ীতে পা দিয়ে দেখি উৎসব শেষ হয়ে গেছে। নিমন্ত্রিত অতিথিরা সকলেই চলে গেছে। রতন সতরঞ্চিগুলো তুলছে, মনু প্রসাদী পাতাগুলো তুলে জল দিয়ে জায়াগাগুলো গোবর জল ছিটিয়ে সাফ করছে। আমাকে দেখে মা এগিয়ে আসে—

"এতক্ষণ তুমি ছিলে কোথায়? তোমার জন্যই বসে রয়েছি। হাতমুখ ধুয়ে এসে প্রসাদ নাও।"

রতন মনু কেউই খায়নি। তিন জনেই এক সঙ্গে খেতে বসলাম, পরিবেষণ করছেন মা। রতন বলে ওঠে—

"লোকনাথ এসেছিল—অনেকক্ষণ ছিল। তোমার খোঁজ করলো, বললাম—কোথাও গেছে বোধহয়।"

সাড়া দিলাম না। মনটা কেমন যেন বিশ্রী লাগে, একা থাকতে চাই। রতনের মনে আগামী দিনের নেশা, সে আবার ঘর বেঁধেছে। পায়ের তলে পেয়েছে কঠিন মৃত্তিকা, চোখে তার ফসলের স্বপ্ন, সমস্ত দুঃখ সমস্ত দুর্ভাগ্যের কথা আজ ভুলতে চায়। অতীত

তার কাছে স্মৃতিমধুর নয়—ব্যথাকাতর। তাই তার চোখ পেছনে অতীতের পানে নয়, সামনে অন্ধকার রাত্রি শেষে আলো রাঙ্গা প্রভাতের দিকেই।

"জমি কালই নোব. এই বছর ফসল তুলবো ওদের গোলাতেই, তার জন্য দাম পাবো ভাগও মিলবে। সামনের বছর থেকে আমার জমি আমার নিজেরই হবে।"

ওর কণ্ঠে খুসীর আবেশ, জবাব দেবার চেষ্টা করি—

"বেশ ত।"

"কই মাছ রাধনি আজ ?"

রতনের কথায় হেসে ফেলে বিন্দু—"বেশ ত তুমি, পূর্ণিমার পূজোতে আঁশ রান্না করতে আছে ?"

"তাও ত বটে! কটা বছর মেলেচ্ছভাবে কাটিয়ে সব নীতি-কর্ম্মও ভুলে গেছলাম, দুঃখও পেয়েছি তার জন্যই বিন্দু!"

চুপ করল রতন। উদ্গত দীর্ঘশ্বাসটাকে চাপতে চেষ্টা করে সে। নিজের অজ্ঞাতসারেই নিজের দুর্বলতম জায়গাতে হাত দিয়ে ফেলেছে। বিন্দুও স্বামীর দিকে চেয়ে থাকে। সমস্ত আনন্দ কোলাহল উজ্জ্বল স্বপ্নের মাঝখানেও আজ এই মধুরাত্রে ওরা স্মরণ করুক ওদের একজনকে, তার জন্যে বেদনা অনুভব করুক—এ আমিও চাই।

নীরবতা ভঙ্গ করে বিন্দু—"চাট্টি ভাত দোব ? দুধ আছে"—

মন্থু মাথা নাড়ে—"হ্যাঁ-হ্যাঁ, একটা পাকা কলাও দিও ওই সঙ্গে।"

বীরা সেন এগিয়ে এলো এমনি দিনে। সেই রাত্রের ঘটনার পর মাঝে মাঝে দেখা হয়। নীরবে হাসে, আমিও মাথা নেড়ে স্বীকৃতি দিয়ে কাজে চলে যাই।

সেদিন সন্ধ্যাবেলাতে আসছি পথটা দিয়ে। ও বাসার ধারে দাঁড়িয়ে ছিল, আমাকে দেখে এগিয়ে আসে। বলে—

"রাজকন্যার প্রাসাদে একবারটি পায়ের ধুলো দেবেন কি ?"

মুখ তুলে চাইলাম। চোখের তারায় তারায় সেই উছল হাসির ঝিলিক। ক্ষণিকের জন্য আমারও মন সাড়া দেয়। তবুও বলি—

"রাত হয়ে গেছে না ?"

"এমন আর কি ? আসুন না!"

গেটটা খুলে দাঁড়াল ধীরা।

চায়ের পেয়ালার সঙ্গে কয়েকটা সন্দেশও এল।

"এ সব কি ?"

"প্রথমদিন এলেন, মিষ্টিমুখ করতে হয়। নিন"—

পরিপাটি করে সাজানো ঘর। একটা আলমারীতে ইংরেজী বাংলা মাসিক আর সাপ্তাহিকের সমাবেশ। বেশ রুচি আছে মনে হল।

"মেয়েরা বেশ সাজাতে গোছাতে পারে।"

আমার কথার জবাবে বলে ওঠে ধীরা—

"অতি বড় ঘরণী না পায় ঘর,
অতি বড় সুন্দরী না পায় বর।"

ধীরা বসে রয়েছে পাশের চেয়ারে। ফিকে নীল সাড়ীতে মানিয়েছে চমৎকার। হাতের কয়েকগাছি চুড়ি আলোতে ঝিকমিক করছে। বাড়ীতে সে আর একটা বুড়ী ঝি। বুড়ি ঝিটা কারণ অকারণে দরজার কাছ দিয়ে যাতায়াত করছে। হেসে ফেলে ধীরা—

"রামের মায়ের নজর দেখেছেন, বুড়ো হয়ে মরতে চল্ল তবু সন্দেহ বাতিক গেল না। পুরুষদের ও দু' চোখে দেখতে পারে না। জানেন রামের বাবা নাকি মদ খেয়ে ওকে বেদম পিটুতো…শেষকালে অন্য কোন একটা মেয়ের সঙ্গে ভেগে গেল। সেই থেকেই ওর এই রাগ পুরুষদের ওপর।"

"পাহারাওয়ালী পেয়েছেন ভালই। যা কড়া নজর।"

"তা সত্যি!"

কথায় কথায় রাত অনেক হয়ে গেল। উঠতে যাবো, বাধা দেয় ধীরা—"রাত অনেক হয়ে গেছে, চাট্টি খেয়েই যান না এখানে।"

"ভয় নেই রামের মা নয়—রান্না আমিই করেছি।"

"কিন্তু বাড়ীতে আবার খাবার নষ্ট হবে ত?"

ধীরা এগিয়ে এসে হাতটা ধরে ফেলে, তার দুচোখে কি যেন একটা আকুতি—"হোক।" কণ্ঠস্বরে কি যেন মাদকতা!

"রামের মা কি ভাববে?"

ধীরার চোখে দুষ্টুমি হাসি খেলে যায়—"ভাবুক, নিন বসুন!"

টেবিলেই বসিয়ে দিয়ে বই খাতাপত্রগুলো টেবিল থেকে সরিয়ে ফেলে সেইখানেই খাবার জায়গা করে ফেলল। রামের মা বুড়ী গন গন করতে করতে ধুয়ে আনল প্লেটগুলো। সে মোটেই এই ব্যাপারটাকে ভাল চোখে দেখেনি। ধীরা হাসে—"আপনি চলে যাবার পর বুড়ী আমাকে একপ্রস্থ তত্ত্বকথা শোনাবে—আর রামের বাবার আর একদফা পিণ্ডির ব্যবস্থা হবে বুঝলেন।"

মাছের কাঁটা চুষতে চুষতে বলে উঠি—"সত্যি আপনি অত্যন্ত Daring।" হেসে ফেলে ধীরা। দুগালে সুন্দর টোল খেয়ে যায়। মুক্তোর মত দাঁত কটা ঝকমক করে ওঠে—"যান, এ অপবাদ মেয়েদের দিতে নেই।"

খাওয়া দাওয়া সেরে যখন বার হয়ে এলাম পাড়া তখন সুপ্তিমগ্ন।

রতন খেয়ে দেয়ে শুয়ে পড়েছে, জেগে আছে বিন্দু আর মন্টু।

"এত দেরী হল আপনার?"

মন্টুর কথার উত্তর দিতে গিয়ে নিজেকে আজ যেন বড় অপরাধী বলেই মনে হয়। বিন্দু খাবার ঠাঁই করে বসে আছে—"খেয়ে নাও জয়ন্ত।"

"খেয়ে এসেছি। নেমতন্ন ছিল বাইরে, বলে যেতে ভুলে গিয়েছিলাম।"

একটু যেন ক্ষুণ্ণ হয় বিন্দু, খাবার তুলে রাখে। আমিও নীরবে ঘরে ঢুকলাম। অনুভব করি, অজ্ঞাতেই আজ ওদের কাছ থেকে যেন দূরে চলে গেছি অনেকখানি। আলোটা নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম। ঘুম আসে না। জানালার ফাঁক থেকে দেখা যায় দু'একটা তারার রোশনী—ম্লান চাহনিতে চেয়ে আছে আমার দিকে। অমনি মলিন বিষণ্ণ চাহনিতে চেয়ে থাকত আমার মিনু। দুটো চোখে থাকত তার অন্তরের সুধা মেশানো! কে জানে মিনু আজ কোথায় কত দূরে? ···দূরে গাছের মাথায় রাতজাগা পাখীর ডানা ঝাপটানর শব্দ... টুকরো কাকলিধ্বনি। হিমেল হাওয়ায় নেমে আসে তন্দ্রার পরশ।

সারাদিন রতন এখন মাঠে...ভোরের শিশির শুকিয়ে যাবার আগেই পাকা ধান কেটে ফেলতে হবে, না হলে ঝরে যাবে ধানের পুরুষ্টু মঞ্জরী। মনু খাবার দিয়ে আসে মাঠে, সন্ধ্যার সময় গাড়ী বোঝাই ধান এসে জমা হয় প্রতিষ্ঠানের খামারে। সারা বছরের সঞ্চয় করবার সময় এই লক্ষীমাস। লোকে বলে মধুমাস···এই সময় সব দুঃখ কষ্ট মানুষ ভুলে যায় আগামী ভবিষ্যতের সুখ স্বপ্নে।

সেদিন স্কুল থেকে ফিরছি—বাড়ীতে পা দিয়ে দেখি—বিন্দু কেমন যেন গম্ভীর হয়ে রয়েছে। মনু আমাকে দেখে এড়িয়ে চলবার চেষ্টা করে। খবরটা দেয় বিন্দুই—"কে একজন তোমার সঙ্গে দেখা করতে এসেছে, তোমার ঘরেই রয়েছে।"

একটু বিস্মিত হই, দেখা করতে আসবার মত কে-ই বা আমার আছে? ঘরে ঢুকতেই একটু বিস্মিত হয়ে যাই!

"আপনি!"

"কেন? আসতে নেই?"

ধীরাকে এখানে দেখব কল্পনাও করতে পারি না।

"আপনার সঙ্গে কদিন দেখা সাক্ষাৎ নেই—ভাবলাম, একবার খবর নিয়ে আসি। বেশ ত ঘর সংসার গুছিয়ে বসেছেন"—

হাসি আসে, "ঘর সংসার আমার? আমি ত খড়কুটো—ওদের ঘাটে ভিড়ে গেছি, আবার কোন দিন হয়ত ভেসে যাবো মাঝ দরিয়ায়"...

ঠিক মানেটা হয়ত বুঝতে পারে না, তাই একটু অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে থাকে। হাজার হোক অতিথি! অভ্যর্থনা না জানালে চলে না। বাইরে গিয়ে মন্টুকে কিছু খাবার আনতে পাঠিয়ে ওর মাকে চায়ের ব্যবস্থা করতে বলাম।

"ও কে?"

"এখানকার মেয়েদের স্কুলের মাষ্টার।"

বিন্দুর চোখের চাহনি কেমন যেন বদলে যায়, পরিচয় শুনে বেশ সন্তুষ্ট হয়েছে মনে হল না।

ধীরার এই কাণ্ড দেখে বিস্মিত না হয়ে পারি না। হঠাৎ বাড়ীতে এসে পাঁচ জনের কৌতূহলী চোখের সামনে একটা ঘটনার অবতারণা করা পছন্দ করি না আমি। পরিচয়টাকে নিয়ে বেশী বাড়াবাড়ি করাটা আমার কাছে বেমানান ঠেকে।

"একদিন আসবেন কিন্তু"—

ধীরা চলে গেল।

ওদের বাড়ীর আবহাওয়ায় কোথায় যেন একটা ঝড় উঠেছে। বিন্দু অকারণে গম্ভীর।

লোকনাথ বাবুকে দেখে এগিয়ে গেলাম...

"চলুন একটু ঘুরে আসি"—বললেন তিনি।

কাজের লোক, আমাকে নিয়ে অসময়ে বেড়াতে বেরুনোটা একটু অস্বাভাবিকই ঠেকে আমার কাছে।

নদীর ধারে বসলাম দুজনে, একথা সে কথার পর স্কুলের প্রসঙ্গে এসে লোকনাথ বাবুর কথায় বিস্মিত হয়ে যাই।

"ধীরা সেনের সঙ্গে আপনার আগে থেকে পরিচয় ছিল কি?"

"না, এইখানে এসেই আলাপ।"

ও, কি যেন ভাবছেন তিনি, কথাটা কিভাবে পাড়বেন ঠিক বুঝে উঠতে পারছেন না হয়ত।

"জানেন ত স্কুলের ব্যাপার। ছেলে মেয়েদের মনে বা অভিভাবকদের মনে কোনরূপ অস্বাভাবিক কিছু একটা রেখাপাত করে সেটা আমরাও চাই না। আপনিও শিক্ষক বোধ হয় কথাটা বুঝতে পারছেন।"

একটু বিরক্তই হই—"যা অনুমান করেছেন বা যা শুনেছেন আমাদের দুজনকে কেন্দ্র করে, সেইটার অনেকখানিই মিথ্যে।"

"তা আমিও জানি জয়ন্তবাবু! কিন্তু কজন মানুষ বুঝবার চেষ্টা করে বলুন! এদের অধিকাংশই না বোঝার দলে—মিথ্যেই সন্দেহ করবে। একটু সাবধান হয়ে থাকাই ভালো নয় কি?"

নীরবে কথাটা শুনি, উত্তর দেবার প্রয়োজন বোধ করি না। এইভাবে এখানেও যে একটা গুঞ্জন উঠবে ভাবিনি। জনমতকে অগ্রাহ্য করবার ক্ষমতা আমাদের কারুর নেই। সন্ধ্যার আলোয় ফিরে আসছি গ্রামের দিকে, লোকনাথবাবুও নীরব—তিনিও যেন বাধ্য হয়ে এই অপ্রিয় আলোচনা করে লজ্জিতই হয়েছেন।

হঠাৎ তিনি আমার হাতে নিবিড় চাপ দিয়ে বলেন—"আমাকে ভুল বুঝবেন না, সকলের মঙ্গলের জন্যই এই কথা বললাম।"

নীরবে তার আন্তরিকতার সমর্থন করি।

সঙ্কুচিত লজ্জিতভাবেই বিদায় নিলেন লোকনাথ বাবু। কথাটা নেহাৎ চাপে পড়েই হয়ত বলতে বাধ্য হয়েছেন। ধীরা সেনও

শুনেছে এই সব কথা। নিজের মনেই কেমন যেন লজ্জা আসে। রাতের অন্ধকারে নীরবে বাড়ীতে ফিরে এলাম।

অন্যদিন এই সময় বাইরের চত্বরে একটা ঝাউ গাছের নীচে বসে আমাদের আসর। রতন হুকো টানতে টানতে কত কথা বলে, আমিও যোগ দিই। কখনও বিন্দুকে রাগাবার চেষ্টা করে রতন—"আজ কি যেন পুজো ছিল না, অকাল ষষ্ঠী না কি?"

"জানি না, যাও।"

পুজো আচ্চা সম্বন্ধে কোন কথা বললে বিন্দু প্রায়ই রেগে যায়। পূজোটুজো করা ওর একটা নেশাতে দাঁড়িয়েছে। আজ জায়গাটা ফাঁকা। বাড়ীর ভেতরে বিন্দু আর রতনের কথাগুলো কানে আসতে থমকে দাঁড়ালাম।

মন্টু শুয়ে পড়েছে। রাতের নীরবতা ভেদ করে কথাগুলো কানে আসতে, শিউরে উঠি। বিন্দু বলে চলেছে—

"সকলেই জানে এই নিয়ে অনেক কথা উঠেছে। সেই মাষ্টারণী সেদিন এখানেও এসেছিল। জয়ন্তও প্রায়ই যায় সেখানে, থাকেও অনেক রাত পর্য্যন্ত। আমিও ছেলেপুলে নিয়ে ঘর করি, আমার বাড়ীতে এসব আসা যাওয়া আমি পছন্দ করি না। লোকে পাঁচকথা আমাকেও শোনায়—মন্টুই বা কি ভাববে।"

বিরক্ত হয়ে ওঠে রতন—"কি যা তা বলছো? জয়ন্তর মত ছেলের নামে এসব শুনেও আমার বিশ্বাস করতে প্রবৃত্তি হয় না। তার কাছে আমাদের ঋণ কোনদিনই ফুরোবে না।"

বিন্দু বলে ওঠে—"বেশ ত বিয়েই করুক ওকে। তা নয় বাড়ীতে বসে এসব কাজে কি করে মত দিই বল?"

তিক্ত কণ্ঠে বলে রতন—"যত সব মেয়ে মানুষের বাজে কথায় কান দেবে। কি করতে বল ওকে? এই বাড়ী ছেড়ে চলে যাবে?"

চুপ করে থাকে বিন্দু—এতবড় কথাটা বলতে বিবেকে হয় ত বাধে। রতন বিড় বিড় করে বলে চলেছে—

"ওসব ঝামেলায় আমি নেই। জয়ন্ত এমন কিছু পাপ করেনি যে সে এ সংসারে থাকলে সংসার আমার ভেসে যাবে। যদি সে না থাকত তবে যে কি হোত তুমি কি জানো না ?"

বিন্দু কথা বলে না। মুখ ভার করে বসে থাকে।

ওদের কথাবার্তা থামলে কিছুক্ষণ পর ঢুকলাম আমি। ওরা সাবধান হয়ে যায়। সহজভাবে কথা কইবার চেষ্টা করে রতন—"শীতের মধ্যে কোথায় ছিলে এত রাত ?"

"লোকনাথ বাবুর অফিসে, এমনি আলাপ আলোচনা করছিলাম।"

উঠে পড়ে রতন, বিন্দুকে বলে—"জায়গা করো। তুমি হাত মুখ ধুয়ে এস জয়ন্ত, খাবার ঠাণ্ডা করে লাভ নেই। কাল ভোর থেকে আবার খাটুনি, এখনও ধান ওঠার অনেক বাকী, শেষ হলে বাঁচি।"

খেতে বসে কোন রকমে আধ খাওয়া করে উঠে পড়লাম। বিন্দুর মুখ চোখ কেমন থমথমে। আমার এই বিচ্যুতিটা ওর মনে কোথায় যেন আঘাত করেছে বেশী মাত্রায়। দোষ ওকে দিই না। মিনুর সমস্ত স্মৃতি ছিল ওদের মনে হয়ত আমাকেই কেন্দ্র করে। মায়ের মনে মেয়ের ছবি ছিল আমারই মাধ্যমে আঁকা। আজ বিন্দু বিশ্বাস করেছে মিনুর সেই স্মৃতির অবমাননা আমি করেছি ওই হীরা সেনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে মিশে। পুরুষের স্বাভাবিক সমস্ত দুর্বলতা গুলোই আমার মধ্যে আছে নিদারুণ ভাবে। নারীর চোখে আজ আমি অতি সাধারণ একটি মানুষ। বিন্দু তাই আমাকে ক্ষমা করতে পারে না কোন মতেই।

কোনরকমে দায় সারা করে পরিবেশন করে যায়। আমারও

খিদে নেই—কোনরকমে উঠতে পারলে বাঁচি। রতন নীরবে চেয়ে থাকে কোন কথাই বলে না।

লক্ষ্য করি সেই রাত্রে বিন্দু খেল না কিছুই। এঁটোগুলো তুলে নিয়ে রান্নাঘরের দরজায় চাবি দিয়ে শুতে গেল আলো নিভিয়ে।

"খেলে না কেন ?"—রতন প্রশ্ন করে স্ত্রীকে।

বিন্দু উচ্চস্বরে জবাব দেয়—"আমার ক্ষিদে নেই।"

রতন রেগে গেছে। কঠিন সুরেই বলে—"কতদিন ক্ষিদে না থাকে তাই দেখি।"

রাত গভীর হয়ে আসে, নীরবে বসে ভাবছি। শান্তিময় সংসারে এ কোন অশান্তির ঝড় তুললাম! একটা মিথ্যে ধারণার আলো-ছায়ায় সত্যি হয়ত হতে পারত; কিন্তু সে ভাবে ধীরা বা আমি কোন দিনই মিশিনি। মানুষের সংগে মানুষের সহজ সবল হৃদ্যতার যে সম্পর্ক হয়, সেটুকুই ছিল আমাদের মধ্যে,—তাই নিয়ে এই তুফান তোলা। হয়ত ধীরার কানেও যাবে এই সব নোংরা কথা। তাকেও ডেকে নিয়ে গিয়ে কর্ত্তৃপক্ষ শোনাবে সাবধান বাণী, হয় ত চাকরীই ছেড়ে যেতে হবে তাকে কোন অনিশ্চিতের পানে। তারও সর্বনাশ করার কোন অধিকার আমার নেই।

নিজের উপরেও দুঃখ হয়। এদের সংসারে আমাকে নিয়েই হয়ত স্বামী স্ত্রীতে আবার ঘনিয়ে আসবে সংঘাতের কালো মেঘ। মন্টুর কাছে আমার মাথা নীচু হয়ে যাবে। এখানের অনেকেই শুনেছে আর অনেক জল্পনা কল্পনা হয়েছে এই নিয়ে। এরপর আর এখানে থাকতে মন চায় না। ওরা জানুক, ওদের দেওয়া অপবাদের উর্দ্ধে আমি। ওদের মনগড়া কলঙ্ক কোন দিনই আমাকে স্পর্শ করেনি। নীরবে দূরে সরে গিয়ে ওদের সমস্ত কিছুর প্রতিবাদ করে যাবো।

রাত আরো গভীর হয়ে আসে। হিমেল রাতের ভাসা ভাসা

কুয়াশার ফাঁক দিয়ে পূবের চাঁদ ম্লান দৃষ্টিতে চেয়ে রয়েছে সুপ্তিমগ্ন পৃথিবীর দিকে। নয়া আবাদে আজ আমার শেষ রাত, জানি না পথ কোনখানে নিয়ে যাবে আমাকে।

মিনুর কথা মনে পড়ে। তাকে আশ্বাস দিয়েছিলাম, ওদের একটা আশ্রয় না খুঁজে দেওয়া পর্য্যন্ত আমার মুক্তি নাই। আজ সে সমস্যা মিটেছে। ওরা পেয়েছে আশ্রয়, পেয়েছে নির্ভর। ওদের হল সুরু—আর তাই আমার হল সারা। ওরা মেনে নিল বাঁধন—আমি নিলাম মুক্তি বিশাল বিশ্বের মাঝে।

রাত শেষ হয়ে আসছে। ওদের ঘুম ভাঙ্‌তে আর দেরী নেই। দু'খানা চিঠি রেখে গেলাম। লোকনাথ বাবুকে জানিয়ে গেলাম তাঁর সমস্ত সন্দেহ অমূলক। প্রতিবাদ নয়, কোন অভিযোগ আমার তাদের বিরুদ্ধে নেই; তাদের কাছ থেকে শুধু বিদায় নিয়ে গেলাম আমি। অন্যখানা রতনের উদ্দেশ্যে।

চিঠি যখন ওদের হাতে পড়বে আমি তখন অনেক দূরে।

সদ্য জাগরিত আমি পথটা বয়ে একা একা চললাম।

পেছনে পড়ে রইল দিগন্ত বিস্তৃত ধানক্ষেত, সোনা ধানের উপর ভোরের শিশির ঝলমল করে উঠবে হাজারো মুক্তাকণার মত আর একটু পরেই সকালের প্রথম আলোয়। দূর উপত্যকার বুক থেকে ভেসে আসে কাদের গানের সুর।

ফসল কুড়ানোর আনন্দে ওরা মত্ত। ওদের ঘরে বাইরে আজ পূর্ণতার জোয়ার। আমার রিক্ত মনে কোন আহ্বান আনে না ওদের এই মধুমাস।

মনে পড়ে মনু রতন আর মিনুর কথা। মিনুর আত্মা সুখী হোক—শান্তি পা'ক। মিনুর সাধনা—আমার এই আত্মনিগ্রহ সার্থক করুক... ওদের জীবনে নেমে আসুক শান্তি—নেমে আসুক পূর্ণতার আশ্বাস।

দূরে চড়াই-এর আড়ালে মিলিয়ে গেল নয়া আবাদের সীমানা... সামনের উৎরাই বেয়ে এগিয়ে চললাম নীরবে।

—শেষ—

একটি সাজানো সংসার, প্রদীপ জেলে শঙ্খধ্বনির সুরে সুরে নেমে আসে সন্ধ্যার প্রথম আভাস। বাবা, মা তাদের পুত্র আর কন্যা। মাটির সঙ্গে তাদের অচ্ছেদ্য যোগাযোগ। বর্ষা আসে, আসে প্রথম ফসল বোনার দিন, শরতের সোনালী রোদে সবুজ ধানক্ষেতের পাশে নালা কন্দরে বসে শাপলা কুমুদের মেলা, শীতের দিনে আসে সোনাফসল পাকার খবর, পূর্ণতায় ভরে ওঠে মাটির বুক—আসে মধুমাস।

তাদের জীবনযাত্রাও এই মহাকালের ঋতুচক্রের সঙ্গে পা ফেলে চলে···কিন্তু হঠাৎ ঘূর্ণিঝড়ে ছিটকে পড়ে তারা। সংসার, মধুময় গ্রাম্যপরিবেশ—স্বপ্ন দেখাদিন কোনদিকে হারিয়ে গেল,.যেন ভাগ্যের নিষ্ঠুর পরিহাসেই তারা নির্বাসিত হলো এখান থেকে।

যেখানে ঠাঁই পেল, সে মাটিতে ফসল ফলেনা। কয়লার কালিতে মনের সব রং সেখানে কালো হয়ে গেছে। মাটি আর মানুষ দুই-ই সেখানে পাথর। মাথাঠুকলে সেখানে করুণা মেলেনা এক কণাও, ললাটই রক্তাক্ত হয়ে যায়।

ভাগ্যের সঙ্গে এখানে চলে মুখোমুখী সংগ্রাম—বাঁচবার জন্যে চলে নিঃশেষ সাধনা। তবু সারামনে তাদের সেই হারানো মাটির জন্য দুঃসহ ব্যাকুলতা···দিনে রাত্রের কাযের মধ্যে সেই সোনা ফসলের হাতছানি যেন ডাক দেয় কোন সুদূর থেকে অহরহ। আবার আসবে—আবার ফিরে আসবে সেই মধুমাস।

···এমনি একটি চিরন্তন সুখ দুঃখের কাহিনীকে প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে বর্ণনা করেছেন শক্তিপদ বাবু। যাদের জীবনের সঙ্গে তাঁর নিবিড় যোগাযোগ—তাদেরই জীবন ফুটে উঠেছে তাঁর বলিষ্ঠ লেখনীতে।

হাসি অশ্রুবিধৌত সকরুণ নিবেদনের গন্ধঢালা ম্লান একটি সৌরভ 'মধুমাস'কে সার্থক করে তুলেছে।